POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026--2028

আল্লাহ্‌র বাণী

هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۙ○

"তিনিই উম্মীদের মধ্য হইতে তাহাদেরই মধ্য হইতে এক রসুল আবির্ভূত করিয়াছেন, যে তাহাদের নিকট তাঁহার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করে, এবং তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও পূর্বে তাহারা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল।

(সূরা জুমআ–৩)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 11

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 10-11

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 5-12 মার্চ- 2026 15-22 রমযান 1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

মসীহর অবতরণ, ইমাম মাহদীর আগমণ এবং ইসলাম ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার সুসংবাদ

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, অচিরেই ইবনে মারইয়াম তোমাদের মাঝে অবতীর্ণ হবেন ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে। তিনি ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, খঞ্জির অর্থাৎ শূকর হত্যা করবেন, এবং জিজিয়া রহিত করবেন। সম্পদ এত প্রাচুর্য লাভ করবে যে কেউ তা গ্রহণ করতে চাইবে না। আর তাঁর যুগে একটি সিজদাহ দুনিয়া ও তার সমস্ত কিছুর চেয়ে উত্তম হবে।" (সহীহ বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া)

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সে সময় জীবিত থাকবে, সে ঈসা ইবনে মারইয়ামকে লাভ করবে, যিনি ইমাম মাহদী হবেন এবং ন্যায়পরায়ণ বিচারক হবেন (অর্থাৎ তিনি উম্মতের বিভিন্ন দলের মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফের সঙ্গে ফয়সালা করবেন)। তিনি ক্রুশ ভেঙে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং জিজিয়া রহিত করবেন। আর তাঁর যুগে যুদ্ধ তার অস্ত্র রেখে দেবে-অর্থাৎ ধর্মীয় যুদ্ধের অবসান ঘটবে।"

(মুসনাদ আহমদ ইবন হাম্বল, খণ্ড ২, পৃ. ৪১১)

হযরত আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: আমরা রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট বসে ছিলাম, এমন সময় তাঁর উপর সূরা আল-জুমু'আর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়: "ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকূ বিহিম (অর্থাৎ: "এবং তাদের মধ্য থেকে অন্যদের প্রতিও, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি।")

আমি নিবেদন করলাম: হে আল্লাহর রসূল! তারা কারা? রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তর প্রদান করলেন না। আমি তিনবার জিজ্ঞেস করলাম। সে সময় হযরত সালমান ফারসী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের মধ্যে বসে ছিলেন। তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর হাত হযরত সালমান (রাযি.)-এর উপর রেখে বললেন:

"যদি ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রের কাছেও চলে যায় (অর্থাৎ অত্যন্ত দূরে অবস্থান করে), তবে এদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি বা কিছু লোক তা সেখান থেকে নিয়ে আসবে।" (বুখারী, কিতাবুত তফসীর, সূরা জুমআ)

আল্লাহ তা'আলার কসম করে লিখছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যে আমি সেই একই প্রতিশ্রুত মসীহ, যার সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম এবং অন্যান্য সহীহ হাদীসের কিতাবসমূহে সুসংবাদ দিয়েছেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর বাণী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"আমাদের ধর্মের সারসংক্ষেপ ও মর্মকথা এই যে- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল)। এ পার্থিব জীবনে আমরা যে আকীদা পোষণ করি এবং আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও তাওফীকের মাধ্যমে যে বিশ্বাস নিয়ে আমরা এই নশ্বর জগত ত্যাগ করব, তা হলো- আমাদের নেতা ও প্রভু হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলেন খাতামুন নবিয়্যীন এবং খায়রুল মুরসালীন। তাঁর মাধ্যমেই দ্বীনের পরিপূর্ণতা সম্পন্ন হয়েছে এবং সেই নেয়ামত চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, যার মাধ্যমে মানুষ সরল পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তা'আলার নিকট পৌঁছাতে পারে। এবং আমরা দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে মানি যে পবিত্র কুরআন হলো আসমানী কিতাবসমূহের খাতাম (সমাপনী গ্রন্থ)। এর শরীয়ত, সীমা, বিধান, হুকুম ও নির্দেশাবলীতে এক বিন্দু বা একটি নুক্তাও বাড়ানো বা কমানো যায় না। এখন আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কোনো ওহী বা ইলহাম আসতে পারে না, যা কুরআনের কোনো বিধান সংশোধন, রহিত, পরিবর্তন বা রূপান্তর করতে পারে। যদি কেউ এমন ধারণা পোষণ করে, তবে আমাদের দৃষ্টিতে সে মুমিনদের জামাতের বাইরে এবং সে মুলহিদ ও কাফের।"

(ইযালা-এ-আওহাম, রূহানী খাযায়িন, খণ্ড ৩, পৃ. ১৬৯-১৭০)

তিনি আরও বলেন: "আমি সেই আল্লাহর কসম করে বলছি যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন- এবং তাঁর উপর মিথ্যা আরোপ করা অভিশপ্তদের কাজ- যে তিনি আমাকে প্রতিশ্রুত মসীহ হিসেবে প্রেরণ করেছেন। যেমন আমি পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহের উপর ঈমান রাখি, তেমনিভাবে বিন্দুমাত্র পার্থক্য না করে আমি সেই সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য ওহীর উপরও ঈমান রাখি, যা আমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, যার সত্যতা তার ধারাবাহিক নিদর্শনের মাধ্যমে আমার উপর সুস্পষ্ট হয়েছে। আমি বাইতুল্লাহতে দাঁড়িয়ে এই শপথ করতে পারি যে যে পবিত্র ওহী আমার উপর অবতীর্ণ হয়, তা সেই একই আল্লাহর কালাম, যিনি হযরত মূসা, হযরত ঈসা এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর উপর তাঁর কালাম অবতীর্ণ করেছিলেন।" (এক ভুলের অপনোদন, পৃ. ৮-৯, প্রকাশিত ১৯০১)

একবার বেরেলীর একজন ব্যক্তি আহমদিয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা, প্রতিশ্রুত মসীহ (আঃ)-এর নিকট লিখে জানতে চান যে, তিনি কি সেই একই প্রতিশ্রুত মসীহ, যার সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীসে সুসংবাদ দিয়েছেন? এবং তিনি যেন আল্লাহর কসম করে এর উত্তর দেন। এর জবাবে তিনি শপথপূর্বক লিখেন:

"আমি পূর্বেও আমার গ্রন্থসমূহে এই বিস্তারিত স্বীকারোক্তি শপথসহ মানুষের নিকট প্রকাশ করেছি এবং এখনো এই পত্রিকায় আল্লাহ তা'আলার কসম করে লিখছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যে আমি সেই একই প্রতিশ্রুত মসীহ, যার সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম এবং অন্যান্য সহীহ হাদীসের কিতাবসমূহে সুসংবাদ দিয়েছেন। আর আল্লাহই যথেষ্ট সাক্ষী।"

(রূহানী খাযায়িন, মালফুযাত, খণ্ড ১, পৃ. ৩২৬-৩২৭)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

ঐশী ইলহামের আলোকে 'হাকাম' ও 'আদল'-এর সিদ্ধান্তসমূহ

সাইয়্যিদনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ-এর সুসংবাদ প্রদান করে বলেন যে, তিনি উম্মতের মধ্যে "হাকাম ও আদল"(ন্যায়পরায়ণ বিচারক ও সংস্কারক) রূপে আগমন করবেন। হাদীস শরীফের বরকতময় বাণী নিম্নরূপ-

"তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তাদের জন্য নিকটবর্তী যে তারা ঈসা ইবনে মরিয়মের সাক্ষাৎ লাভ করবে-তিনি ইমাম মাহদী ও ন্যায়পরায়ণ বিচারক হবেন; তিনি ক্রুশ ভেঙে দেবেন এবং শূকর হত্যা করবেন।"

(মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বল, খণ্ড ২, পৃ. ৪১১, মিশর সংস্করণ, হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত)

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা ঈসা ইবনে মরিয়মের সাক্ষাৎ লাভ করবে। তিনি ইমাম মাহদী ও ন্যায়বিচারক হবেন। তিনি উম্মতের মতভেদসমূহের ফয়সালা করবেন। তিনি ক্রুশ ভেঙে দেবেন এবং শূকর হত্যা করবেন।

এই হাদীসে প্রতিশ্রুত মসীহকে "হাকাম"ও "আদল"বলা হয়েছে-এর স্পষ্ট অর্থ এই যে, তাঁর যুগে মুসলমানরা বহু দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং তাদের মধ্যে চরম মতভেদ দেখা দেবে। ইসলামি আকীদা ও বিধিবিধান বুঝতে গিয়ে তারা এমন ভুল ধারণায় পতিত হবে যে আলেমরাও সেই মতভেদ দূর করতে অক্ষম হয়ে পড়বেন। তখন ইমাম মাহদী, যিনি আল্লাহর প্রতিনিধি হবেন, ঐশী ওহীর আলোকে এসব মতভেদ দূর করবেন।

যখন আল্লাহ তা'আলা সাইয়্যিদনা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ রূপে "হাকাম ও আদল-এর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন মুসলমানদের বিভিন্ন দলের মধ্যে মতভেদ এমন চরমে পৌঁছেছিল যে সাধারণ মানুষ তো বটেই, আলেমরাও তীব্র বিরোধে লিপ্ত ছিলেন। তারা নিজেদের উদ্ভাবিত আকীদা পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন না; বরং হিকমতের সঙ্গে বোঝানোর পরিবর্তে নিজেদের মুসলমান দাবি করেও মুসলমানদের বিরুদ্ধেই তরবারির জিহাদে লিপ্ত ছিল-এবং এখনও আছে। সামান্য বিষয়েও একে অপরকে মুরতাদ ঘোষণা করে হত্যা করছিল। যারা তাঁকে গ্রহণ করেনি, তাদের অবস্থাও একই রয়ে গেছে।

এখন আমরা সংক্ষেপে সেসব ভ্রান্ত বিশ্বাসের উল্লেখ করব, যা মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং যেগুলোর সংশোধন হযরত মির্জা গুলাম আহমদ কাদিয়ানী, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) করেছেন।

(১) খ্রিষ্টানদের প্রভাবে কুরআন ও হাদীসের পরিপন্থী এই বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়েছিল যে, হযরত ঈসা (আ.) তাঁর জৈবিক দেহসহ আকাশে জীবিত আছেন এবং সেই দেহসহই অবতরণ করবেন মুসলমানদের সংস্কারের জন্য। আল্লাহ তা'আলা প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-কে কুরআনুল কারীম থেকে ত্রিশটি দলীল শিক্ষা দেন, যার দ্বারা দিবালোকের ন্যায় প্রমাণিত হয় যে ঈসা (আ.)-কে আল্লাহ ক্রুশবিদ্ধ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন, তিনি বনী ইসরাঈলের হারানো ভেড়াদের অনুসন্ধানে হিজরত করেন এবং ১২০ বছর বয়সে কাশ্মীরে ইন্তেকাল করেন। শ্রীনগরের খানইয়ার মহল্লায় তাঁর কবর বিদ্যমান। আজ শুধু মুসলিম পণ্ডিতই নন, অন্যান্য ধর্মের গবেষকরাও ঈসা (আ.)-এর ইন্তেকালের পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করছেন এবং কাশ্মীর অভিমুখে তাঁর হিজরতের পক্ষে গবেষণা প্রকাশ করেছেন।

ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুকে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি খ্রিষ্টানদের এই ভ্রান্ত আকীদা-যে যীশু ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পুত্র-তা ভেঙে চূর্ণ করেন; পাশাপাশি মুসলমানদের এই ভুল ধারণাও খণ্ডন করেন যে ঈসা (আ.) দেহসহ আকাশে গমন করেছেন এবং পুনরায় সেই দেহসহ অবতরণ করবেন। এই মহান সত্য প্রকাশের পর বহু মুসলিম ও খ্রিষ্টান চিন্তাবিদ আহমদিয়্যত তথা প্রকৃত ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। আর যারা এই সৌভাগ্য লাভ করেননি, তারা প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনকে অস্বীকার করে একে কল্পকাহিনি বলে আখ্যা দিয়েছেন; এভাবে তারা শুধু কুরআন-হাদীসই নয়, বরং উম্মতের সেই হাজারো বুযুর্গকেও অস্বীকার করেছেন, যারা ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন।

(২) মুসলমানদের মধ্যে আরেকটি ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, মহানবী (সা.) এমন শেষ নবী যে তাঁর পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসতে পারেন না-যদিও তিনি তাঁরই উম্মতভুক্ত হন।

প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) কুরআনের দলীল দ্বারা প্রমাণ করেন যে নবুয়ত একটি মর্যাদা, যা এখন মহানবী (সা.)-র উম্মতদের জন্য নির্দিষ্ট। তিনি বলেন, যেহেতু তিনি মহানবী (সা.)-র একজন অনুগত বান্দা, তাই এই দাসত্বের বরকতেই আল্লাহ তাঁকে নবুয়ত ও ইলহাম-সংলাপের সম্মান দান করেছেন।

তিনি মুসলমানদের এই অসংগতিও তুলে ধরেন যে, তারা একদিকে বলেন মহানবী (সা.)-র পর কোনো নবী আসতে পারেন না, অন্যদিকে আবার বনী ইসরাঈলের নবী ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমনকে স্বীকার করেন। অর্থাৎ, উম্মতে মুহাম্মদিয়ায় মহানবী (সা.)-এর অনুগামী হিসেবে কোনো নবীর আগমন অস্বীকার করে, অথচ পূর্ববর্তী এক নবীর প্রত্যাবর্তন স্বীকার করে-তারা কার্যত মহানবী (সা.)-র মর্যাদা খর্ব করছেন। তিনি বলেন:

"আমি যদি মহানবী (সা.)-এর উম্মত না হতাম এবং তাঁর অনুসরণ না করতাম, তবে যদি পৃথিবীর সমস্ত পর্বতের সমান আমলও আমার থাকত, তবুও আমি কখনও আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথনের এই সম্মান লাভ করতে পারতাম না। এখন মুহাম্মদীয় নবুয়ত ব্যতীত সকল নবুয়ত বন্ধ। শরীয়তধারী কোনো নবী আসতে পারেন না। শরীয়তবিহীন নবী আসতে পারেন, তবে তিনি অবশ্যই প্রথমে উম্মত হতে হবে।"

(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়্যাহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড ২০, পৃ. ৪১১-৪১২)

আলহামদুলিল্লাহ, গত এক শতাব্দীরও বেশি সময়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেদের ভুল সংশোধন করে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর উপর ঈমান এনেছেন। বহু প্রখ্যাত আরব পণ্ডিতও সত্য প্রকাশিত হলে মহানবী ? এবং তাঁর এই সত্যনিষ্ঠ বান্দার প্রতি দরূদ প্রেরণ করেছেন।

(৩) আরেকটি বিপজ্জনক ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, সশস্ত্র জিহাদ এখনও চালু আছে এবং আগত ইমাম মাহদী তরবারির মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করবেন। প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) ব্যাখ্যা করেন যে, মহানবী (সা.) স্পষ্টভাবে বলেছেন তাঁর যুগে তরবারির জিহাদ রহিত হবে। সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে যে মসীহ আগমন করলে "তিনি যুদ্ধের অবসান ঘটাবেন"(কিতাবুল আম্বিয়া, বাব নুযূল ঈসা ইবনে মরিয়ম)। অন্য হাদীসে আছে যে তিনি জিযিয়া রহিত করবেন (সহীহ মুসলিম)।

হযরত গরুৎধ এযঁষধস অযসধফ (আ.) ঘোষণা করেন যে আল্লাহ তাঁকে এই যুগে ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ রূপে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর যুগে তরবারির জিহাদ রহিত। তিনি বলেন:

"হে ইসলামের আলেম ও মোল্লারা! আমার কথা শোনো। আমি সত্য সত্য বলছি-এখন জিহাদের সময় নয়। আল্লাহর পবিত্র নবীর অবাধ্য হয়ো না। যে প্রতিশ্রুত মসীহ আসার কথা ছিল, তিনি এসে গেছেন এবং তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে ধর্মীয় যুদ্ধ, যা তরবারি ও রক্তপাতের মাধ্যমে হয়, তা থেকে বিরত থাকো।

তিনি আরও বলেন:

"এখন যখন প্রতিশ্রুত মসীহ এসে গেছেন, তখন প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য জিহাদ থেকে বিরত থাকা যে ব্যক্তি চোখ রাখে এবং হাদীস ও কুরআন পাঠ করে, সে বুঝতে পারবে যে এই যুগে যে জিহাদ চলছে তা ইসলামি জিহাদ নয়; বরং নফসের প্ররোচনা বা স্বর্গলাভের কাঁচা আশায় সংঘটিত অবৈধ কাজ।"

তিনি ঘোষণা করেন: "দেখো, আমি তোমাদের কাছে একটি হুকুম নিয়ে এসেছি-এখন থেকে তরবারির জিহাদের সমাপ্তি। তবে নফসের পরিশুদ্ধির জিহাদ অবশিষ্ট আছে। আর এ কথা আমি নিজের পক্ষ থেকে বলিনি; বরং এটি আল্লাহর ইচ্ছা।" (গভর্নমেন্ট ইংরেজি অওর জিহাদ)

তাঁর কাব্যে তিনি লেখেন:

"এ বন্ধুজন! জিহাদের চিন্তা এখন ত্যাগ করো,

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

আল্লাহ্ তোমাদের বোঝা লঘু করিতে চাহেন, কারণ মানুষকে দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে। (আন-নিসা: ২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Shohrae Alam & Alia Bibi
From-Mahmood Alam Sb. Barisha, 24 PGS (S)

যুগ ইমামের বাণী

জ্ঞান বলতে যুক্তি কিম্বা দর্শনশাস্ত্রকে বোঝানো হয় না, বরং প্রকৃত জ্ঞান সেটাই যা আল্লাহ তা'লা (মানুষকে) কেবল নিজ কৃপাগুণে দান করেন।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৯৫)

দোয়াপ্রার্থী: Late Haji Ansar Mandal
From-Rezuwan Islam Mandal. Bithari, 24 PGS (N)

জুমআর খুতবা

আনহযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেম-এলাহীর হৃদয়গ্রাহী ও মনোমুগ্ধকর বর্ণনা

হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) বর্ণনা করেন যে, জীবনের অন্তিম সময়ে আল্লাহ তাআলা মহানবী মহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন-আপনি চাইলে এ দুনিয়াতেই অবস্থান করতে পারেন, আর চাইলে আমার সান্নিধ্যে চলে আসতে পারেন। তখন তিনি নিবেদন করলেন, "হে আমার রব! এখন আমি তোমার দিকেই যেতে চাই।" তাঁর পবিত্র প্রাণ যে শেষ বাক্যের ওপর বিদায় নিল, তা ছিল- "বির রফীকিল আ'লাচ-অর্থাৎ, "আমি সর্বোচ্চ সঙ্গীর নিকট যেতে চাই।"

এ ঘটনা তাঁর প্রেম-এলাহীর গভীরতা ও পরাকাষ্ঠার এক উজ্জ্বল প্রমাণ। বস্তুত, মহানবী (সা.)-এর জীবনের প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি মুহূর্ত এ সত্যের সাক্ষ্য বহন করে যে, তাঁর অন্তর সর্বদা আল্লাহর প্রেমে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর হৃদয়ে যেন প্রেম-এলাহীর এক উত্তাল সমুদ্র সর্বক্ষণ আন্দোলিত হতো।

তিনি এমন কোনো সুযোগ হাতছাড়া করতেন না, যেখানে আল্লাহ তাআলার তাওহীদের আলোচনা করা যায় না। তাঁর প্রতিটি শব্দ থেকে আল্লাহর প্রতি গভীর ভালোবাসা ঝরে পড়ত। যখনই তিনি কথা বলতেন, মনে হতো তাঁর হৃদয় আল্লাহর প্রেমে কানায় কানায় পূর্ণ-সেখানে অন্য কিছুর স্থান নেই।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি যেমন গভীরভাবে আল্লাহর একত্ব ও প্রেমকে অনুধাবন করেছেন, তেমনি তাঁর অনুসারীদেরও তা শিক্ষা দিন-যেন তারা হৃদয়ের গভীর থেকে আল্লাহর তাওহীদ ও ভালোবাসার স্বীকৃতি দেয় এবং প্রতিটি বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে।

পরকালে কোনো পার্থিব অবলম্বন উপকারে আসবে না; কার্যকর হবে কেবল আল্লাহর অনুগ্রহ। আর সেই অনুগ্রহ লাভের প্রধান উপায় হলো মহানবী (সা.)-এর সুন্নতের অনুসরণ, তাঁর আনুগত্য ও পূর্ণ অনুকরণ। কেননা আল্লাহ তাআলা নিজেই ঘোষণা করেছেন:

"ফাত্তাবি'উনী ইউহবিবকুমুল্লাহ"- অর্থাৎ, "(হে নবী!) বলে দিন, তোমরা যদি আমার অনুসরণ কর, তবে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।" (সূরা আলে ইমরান: ৩২)

মহানবী (সা.) নিজ জীবনে এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, যা আমাদের দেখায়-আল্লাহর প্রেমেরও এক চরম সীমা আছে; আত্মোৎসর্গেরও এক পরাকাষ্ঠা আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আছে প্রজ্ঞা, ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা-যা আল্লাহ তাআলারই নির্দেশিত পথ।

তিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহর স্মরণে মশগুল থাকতেন। যখনই কোনো আনন্দের সংবাদ পেতেন বা কোনো সুখবর শুনতেন, সঙ্গে সঙ্গে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন।

এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন-

সকালের নামাজের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত যারা আল্লাহর জিকিরে রত থাকে, তাদের সঙ্গে বসে থাকা আমার নিকট হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধর চারজন দাস মুক্ত করার চেয়েও অধিক প্রিয়। অনুরূপভাবে, আসরের নামাজের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত যারা আল্লাহর জিকিরে রত থাকে, তাদের সঙ্গে বসে থাকাও চারজন দাস মুক্ত করার চেয়ে অধিক প্রিয়।

আল্লাহ! প্রেম-এলাহীর কী অপূর্ব মহিমা! তিনি নিজে যেমন এ প্রেমের শিখরে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তেমনি তাঁর সাহাবীদের মাঝেও সে প্রেম সঞ্চারিত করতেন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৩০ জানুয়ারী, ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (৩০ সুলাহ ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, অসংখ্য ঘটনা আছে যা প্রমাণ করে যে পবিত্র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অন্তরে আল্লাহর প্রতি গভীর প্রেম বিদ্যমান ছিল। প্রকৃতপক্ষে তাঁর জীবনের প্রতিটি কাজ ও প্রতিটি ঘটনা এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছায় যে তাঁর হৃদয়ে সর্বদা ঐশী প্রেমের এক উত্তাল সাগর উদ্বেলিত হতো। এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখা যায় উহুদের যুদ্ধে, যেখানে আল্লাহর প্রেমের প্রতি তাঁর গভীর ও অনন্য আবেগ এক বিস্ময়কর রূপে প্রকাশিত হয়েছে।

বর্ণিত আছে যে হযরত বারা' (রা.) বলেন, উহুদের দিন আমরা মুশরিকদের মোকাবিলা করি। পবিত্র নবী (সা.) একদল তীরন্দাজ নিয়োগ করেন এবং হযরত আবদুল্লাহ (রা.)-কে তাদের নেতা নিযুক্ত করেন। তিনি অত্যন্ত জোর দিয়ে তাদের নির্দেশ দেন যেন তারা নিজেদের অবস্থান ত্যাগ না করে। তিনি বলেন, তোমরা যদি দেখ যে আমরা তাদের উপর বিজয়ী হচ্ছি, তবুও তোমরা তোমাদের স্থান ত্যাগ করবে না; আর যদি দেখ যে তারা আমাদের উপর বিজয়ী হচ্ছে, তবুও আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। অর্থাৎ বিজয় বা পরাজয়-কোন অবস্থাতেই তোমরা তোমাদের অবস্থান ছেড়ে যাবে না।

এই ঘটনার চূড়ান্ত পর্যায়ে তাঁর অন্তরে ঐশী প্রেমের উত্তাপ স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়। বর্ণনাকারী বলেন, যখন আমরা যুদ্ধে লিপ্ত হলাম, শত্রুরা পিছু হটতে লাগল। আমি এমনকি দেখলাম মুশরিক নারীরা পাহাড়ের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে, তাদের পায়ের কাপড় তুলে ধরছে, ফলে তাদের নূপুর দেখা যাচ্ছিল। মুসলমানরা বলতে শুরু করল, "গনিমতের মাল! গনিমতের মাল!" হযরত আবদুল্লাহ (রা.) তাদের থামানোর চেষ্টা করলেন-তিনি তাঁর দলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে নবী (সা.) তাকে স্থান ত্যাগ না করার কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন-কিন্তু তারা তাঁর কথা শোনেনি। যখন তারা পাহাড়ের গিরিপথ ছেড়ে গনিমতের মাল সংগ্রহে গেল, তখন আল্লাহ তাআলাও তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। অর্থাৎ তারা যখন গিরিপথ ছেড়ে গেল, তখন আল্লাহ তাদের থেকে সাহায্য প্রত্যাহার করলেন। যুদ্ধের পরিস্থিতি পাল্টে গেল, শত্রুরা পুনরায় আক্রমণ করল, এবং সত্তরজন মুসলমান শহীদ হলেন।

এই সময় মহানবী (সা.) কয়েকজন সাহাবিকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখন আবু সুফিয়ান উঁচু স্থানে উঠে চিৎকার করে বলল, "মুহাম্মদ কি লোকদের মধ্যে আছে?"নবী (সা.) বললেন, " তোমরা উত্তর দিও না।" এরপর

সে বলল, "আবু কুহাফার পুত্র কি তাদের মধ্যে আছে?"নবী বললেন, "উত্তর দিও না।" তারপর সে বলল, "খাত্তাবের পুত্র উমর কি তাদের মধ্যে আছে?"যখন কোনো উত্তর এল না, আবু সুফিয়ান বলল, "এরা সবাই নিহত হয়েছে। যদি জীবিত থাকত, উত্তর দিত।" হযরত উমর (রা.) নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না এবং বললেন, "হে আল্লাহর শত্রু! তুমি মিথ্যা বলেছ। আল্লাহ তাদের জীবিত রেখেছেন যারা তোমাকে লাঞ্ছিত করবে।"

এরপর আবু সুফিয়ান জয়ধ্বনি দিয়ে বলল, "হুবাল -এর হোক!"এ কথা শুনে নবী (সা.) অস্থির হয়ে উঠলেন এবং বললেন, "তোমরা তাকে উত্তর দাও।" সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা কী বলব?"তিনি বললেন, "বলো: আল্লাহ সর্বোচ্চ এবং মহামহান।"

আবু সুফিয়ান আবার বলল, "আমাদের আছে উজ্জা, আর তোমাদের কোনো উজ্জা নেই।" নবী (সা.) বললেন, "তাকে উত্তর দাও।" সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা কী বলব?"তিনি বললেন, "বলো: আল্লাহ আমাদের অভিভাবক, আর তোমাদের কোনো অভিভাবক নেই।"

(সহীহ বুখারি, কিতাবুল মাগাজি, উহুদের যুদ্ধ অধ্যায়, হাদিস ৪০৪৩)

অতএব, যখন আল্লাহর সম্মান ও তাঁর প্রেমের প্রশ্ন উঠল, তখন তিনি নিজের জীবনের কোনো পরোয়া করলেন না। সঙ্গে সঙ্গে সাহাবাদের উত্তর দিতে বললেন। এর আগে প্রজ্ঞাবশত তিনি উত্তর দিতে নিষেধ করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ইতিহাসের উদ্ধৃতি দিয়ে আরও লিখেছেন। তিনি লিখেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চারপাশে যারা ছিলেন এবং কাফেরদের আক্রমণে যারা পিছু হটেছিলেন, কাফেররা সরে গেলে তারা আবার তাঁর চারপাশে সমবেত হলেন। তাঁকে উঠিয়ে ধরলেন, কারণ আঘাতের ফলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। এক সাহাবি, উবাইদাহ বিন আল-জাররাহ (রা.), দাঁত দিয়ে তাঁর মাথায় ঢুকে থাকা লোহার টুকরো বের করেন, ফলে তাঁর নিজের দুটি দাঁত ভেঙে যায়। কিছুক্ষণ পর রাসূলুল্লাহ (সা.) জ্ঞান ফিরে পান। তিনি (সা.) আহত হয়ে জ্ঞান হারিয়েছিলেন, যেমনটি ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

শত্রুরা গুজব ছড়িয়েছিল-নাউযুবিল্লাহ-যে তিনি শহীদ হয়েছেন। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর সাহাবারা যুদ্ধক্ষেত্রে লোক পাঠালেন ঘোষণা করার জন্য যে রসূলুল্লাহ জীবিত আছেন, যাতে ছত্রভঙ্গ মুসলমানরা ফিরে আসে। পালিয়ে যাওয়া সৈন্যরা আবার একত্রিত হতে লাগল। এরপর রসূলুল্লাহ তাদের নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান নিলেন। অবশিষ্ট সৈন্যদল সেখানে দাঁড়ালে আবু সুফিয়ান উচ্চস্বরে ঘোষণা করল, "আমরা মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করেছি।" নবী (সা.) উত্তর দিলেন না, যাতে শত্রুরা প্রকৃত অবস্থা বুঝে পুনরায় আক্রমণ না করে এবং তারা বুঝতে পারে যে মুসলমানরা মৃত নয়, বরং আহত হয়েছে। আর মুসলমানরা যেহেতু আহত অবস্থায় আছে, তাই আরেকটি আক্রমণ তারা সহ্য করতে পারবে না আর আহত মুসলমানরা শত্রুদের আক্রমণের শিকার হয়ে পড়বে। কোনো উত্তর না পেয়ে আবু সুফিয়ান তার ধারণায় নিশ্চিত হয়ে বলল, "আমরা আবু বকরকেও হত্যা করেছি।" নবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে উত্তর দিতে নিষেধ করলেন। তারপর সে চিৎকার করল, "আমরা উমরকেও হত্যা করেছি।" হযরত উমর (রা.) আবেগপ্রবণ হয়ে উত্তর দিতে চাইলেন যে আল্লাহর কৃপায় আমরা জীবিত আছি এবং তোমাদের মোকাবিলায় প্রস্তুত, কিন্তু নবী (সা.) তাকে নিষেধ করলেন, বললেন মুসলমানদের বিপদে ফেলো না; নীরব থাকো। তখন তারা দুর্বল অবস্থায় ছিলেন, এবং নতুন আক্রমণ আরও ক্ষতির কারণ হতে পারত।

এখন কাফেররা নিশ্চিত হল যে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা ও তাঁর দুই প্রধান সহচর নিহত হয়েছেন। আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীরা আনন্দের সাথে স্লোগান দিল, "হুবল মহান! হুবল মহান! আমাদের সম্মানিত মূর্তি হুবাল শ্রেষ্ঠ, কারণ আজ সে ইসলামকে ধ্বংস করেছে।" যে মহান নবী নিজের মৃত্যু, আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যু এবং উমর (রা.)-এর মৃত্যুর ঘোষণায় নীরব থাকতে বলেছিলেন-যাতে আহত মুসলমানদের উপর আবার আক্রমণ না হয় এবং মুষ্টিমেয় মুসলমানদের তাদের হাতে শহীদ হতে হয়- তিনি এক আল্লাহর সম্মান প্রশ্নের মুখে পড়তে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে শিরকের জয়ধ্বনি উঠতেই অস্থির হয়ে উঠলেন। গভীর আবেগে সাহাবাদের দিয়ে চেয়ে বললেন, "তোমরা উত্তর দিচ্ছ না কেন?"তারা বলল, "হে আল্লাহর রসূল, আমরা কী বলব?"তিনি বললেন, "বলো: আল্লাহ সর্বোচ্চ ও মহান। আল্লাহ সর্বোচ্চ ও মহান। তোমরা মিথ্যা বলছ যে হুবল শ্রেষ্ঠ। এক-অদ্বিতীয় আল্লাহই সম্মানিত, সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই-হুবলের নয়।" এভাবে তিনি শত্রুর কাছে নিজের জীবিত থাকার বিষয়টিও প্রকাশ করলেন।

এই সাহসী উত্তরের প্রভাব কাফের বাহিনীর উপর এত গভীর ছিল যে, যদিও তাদের আশা ভঙ্গ হল এবং যদিও তাদের সামনে মুষ্টিমেয় আহত মুসলমান দাঁড়িয়ে ছিল-যাদেরকে তারা পার্থিব বিচারে সহজেই আক্রমণ করে মেরে ফেলতে পারত- তবুও তারা আর আক্রমণ করার সাহস পেল না। তারা যে সামান্য বিজয় পেয়েছিল তা নিয়েই উল্লসিত হয়ে মক্কায় ফিরে গেল।

(সূত্র:তাফসিরুল কুরআনের ভূমিকা, আনওয়ারুল উলূম, খণ্ড ২০, পৃষ্ঠা ২৫২-২৫৩)

মহানবী (সা.) আল্লাহর প্রেমের ক্ষেত্রে শিরকের সামান্যতম ছায়াও প্রবেশ করতে দিতেন না।

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী (সা.)-কে বলল, "যা আল্লাহ চান এবং আপনি চান।" নবী বললেন, "তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ বানালে? বরং বলো: যা আল্লাহ একাই চান।"

(সুনান ইবন মাজাহ, কিতাবুল কাফফারাত, হাদিস ২১১৭)

শিরকের সামান্যতম দিকও যেন প্রবেশ না করে। কেউ কেউ বলে থাকে, "আল্লাহ চাইলে এবং আপনি চাইলে।" হ্যাঁ, বলা যায় যে আল্লাহ চাইলে এবং আল্লাহর কৃপা ও দোয়ার মাধ্যমে বরকত হবে-দোয়ার সীমা পর্যন্ত তা সঠিক। কিন্তু "এবং আপনি চাইলে"বলা ভুল, কারণ নবী (সা.) এ বিষয়ে কঠোর অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

তিনি (সা.) আরও চিন্তিত ছিলেন যাতে মানুষ কবরকে উপাসনালয়ে পরিণত না করে। দুর্ভাগ্যবশত আজ তার বিপরীত চর্চা দেখা যায়। যেমন পূর্বে উল্লেখ হয়েছে, মুসলমানরা পীর-ফকিরদের কবরে গিয়ে উপাসনার সদৃশ কাজ করে, এমনকি সিজদাও করে, অথচ তিনি কবরকে সিজদা স্থলে পরিণত করতে নিষেধ করেছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, যে অসুস্থতায় তিনি ইন্তেকাল করেন, সেই সময় নবী (সা.) বলেন: "আল্লাহ ইহুদি ও খ্রিস্টানদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করুন; তারা তাদের নবীদের কবরকে উপাসনালয়ে পরিণত করেছে।" হযরত আয়েশা বলেন, যদি তিনি এ কথা না বলতেন, তবে তাঁর কবর উন্মুক্ত রাখা হতো; কিন্তু আমি আশঙ্কা করি তা সিজদা স্থলে না পরিণত হয়। তাই তা উন্মুক্ত রাখা হয়নি, যাতে তা উপাসনার স্থান না হয়ে যায়।

(সহীহ বুখারি, কিতাবুল জানায়েয, হাদিস ১৩৩০)

বর্তমানে কর্তৃপক্ষ যথারীতি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, সেখানে চারপাশে প্রাচীর ও বেষ্টনী স্থাপন করেছে, যাতে কোনো প্রকার শিরক সংঘটিত না হয়। অন্তত এ বিষয়ে তারা ভালো কাজ করেছে, কারণ তিনি শিরকের প্রতি গভীর বিরাগ পোষণ করতেন।

আল্লাহর একত্ববাদ সম্পর্কে হযরত উবাই ইবন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত, মুশরিকরা রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলল, "আপনার প্রতিপালকের বংশপরিচয় আমাদের বর্ণনা করুন।" তখন আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন: ***'কুল হুআল্লাহু আহাদ-আল্লাহুস সামাদ'*** "বলুন, তিনি আল্লাহ, এক। আল্লাহ, অমুখাপেক্ষী।" অর্থাৎ আল্লাহ এক, স্বয়ংসম্পূর্ণ। তিনি জন্ম দেন না, তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয়নি; কারণ যা জন্ম নেয় তা মৃত্যুবরণ করবে, আর যা মৃত্যুবরণ করে তার উত্তরাধিকারী থাকে। কিন্তু আল্লাহ, পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত, তিনি না মৃত্যুবরণ করেন, না তাঁর কোনো উত্তরাধিকারী আছে, না তাঁর সমকক্ষ কেউ আছে। বর্ণনাকারী বলেন: তাঁর কোনো সাদৃশ্য নেই, কোনো সমকক্ষ নেই, এবং তাঁর তুলনীয় কেউ নেই।

(সুনান আত-তিরমিজি, তাফসির অধ্যায়, সূরা আল-ইখলাস, হাদিস ৩৩৬৪)

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোনো সুযোগই হাতছাড়া করতেন না যাতে আল্লাহ তাআলার একত্বের (তাওহিদ) উল্লেখ না থাকে। তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দে আল্লাহর প্রেম ঝরে পড়ত। তিনি যখনই কথা বলতেন, তখনই প্রতিটি শব্দ থেকে স্পষ্ট প্রকাশ পেত যে আল্লাহ তাআলার ভালোবাসায় তাঁর হৃদয় পরিপূর্ণ; বরং তাঁর হৃদয় এতটাই ঐশী প্রেমে পূর্ণ ছিল যে সেখানে অন্য কিছুর স্থানই ছিল না।

হযরত যায়েদ বিন খালিদ আল-জুহানী (রাযি.) বর্ণনা করেন যে, এক রাতে বৃষ্টিপাতের পর হুদায়বিয়ায় রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের ফজরের নামাজ পড়ান। নামাজ শেষে তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন, "তোমরা কি জানো, তোমাদের প্রতিপালক, মহান ও মহিমান্বিত, কী বলেছেন?"আল্লাহ অন্তর্যামী। বৃষ্টি দেখে মানুষের মনে যে চিন্তার উদয় হয়েছিল, তা আল্লাহ জানতেন এবং তিনি তা নবী (সা.)-কে অবহিত করেন। লোকেরা বলল, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই উত্তম জানেন।" তিনি বললেন, "আল্লাহ বলেন: আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ কেউ সকাল করেছে আমার উপর ঈমান নিয়ে, আর কেউ কেউ কুফর নিয়ে।" অর্থাৎ রাতে বৃষ্টি দেখে কেউ ঈমানদার হয়ে সকাল করেছে, আবার কেউ অবিশ্বাসী হয়ে সকাল করেছে। যে বলেছে, 'আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমতের কারণে আমাদের উপর বৃষ্টি হয়েছে,' সে আমার উপর ঈমান এনেছে এবং নক্ষত্রদের অস্বীকার করেছে। সে সময় নক্ষত্র-পূজাও প্রচলিত ছিল। ধর্মীয় প্রশিক্ষণ তখনও ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং অনেক প্রাক্তন মুশরিক সদ্য ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাই কেউ কেউ বলত, 'অমুক নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হয়েছে।' সুতরাং যে বলে, 'নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হয়েছে,' সে আমার অস্বীকারকারী এবং নক্ষত্রে বিশ্বাসকারী।" (সহীহ আল-বুখারি, কিতাবুল আযান, হাদিস ৮৪৬)

যুগ খলীফার বাণী

যদি তোমরা ইহকাল ও পরকালের সফলতা এবং মানুষের মন জয় করতে চাও, তবে পবিত্রতা অবলম্বন কর, নিজেকে পরিছন্ন রাখ এবং নিজের উত্তম আচরণের নমুনা প্রদর্শন কর। তবেই তোমরা সফলকাম হবে।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১লা জানুয়ারী, ২০১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

অতএব আল্লাহ তাআলা তাঁকে নির্দেশ দিলেন: হে মুহাম্মদ (সা.), যেমন তুমি আল্লাহর একত্বকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছ, তেমনি তোমার অনুসারীদেরও জানিয়ে দাও যে কত সূক্ষ্মভাবে ও গভীরভাবে প্রত্যেক বিষয়ে আল্লাহর তাওহিদ ও তাঁর প্রেম স্বীকার করতে হবে। হৃদয়ের গভীরতা থেকে এতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে।

হযরত জাবির (রাযি.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী (সা.)-এর কাছে এসে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! কোন দুটি বিষয় জান্নাত ও জাহান্নামকে অবধারিত করে?" তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মারা যায় যে সে আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করে না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি এ অবস্থায় মারা যায় যে সে আল্লাহর সঙ্গে শরিক স্থির করেছে, সে আগুনে প্রবেশ করবে।"

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদিস ৯৩)

আজও যে কেউ শরিক (শিরক) কী-এ প্রশ্ন করলে এ উত্তরই যথেষ্ট। যেমন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) উল্লেখ করেছেন, জাগতিক উপায়-উপকরণের উপর নির্ভর করা, নিজের উপর নির্ভর করা, নিজের যোগ্যতা, সম্পদ, পরিবার, বংশ বা সন্তানদের উপর নির্ভর করা-সংক্ষেপে, আল্লাহকে অগ্রাধিকার না দিয়ে এবং তাঁর নাম উচ্চারণ না করে অন্য কিছুর উপর নির্ভর করা-এগুলো শিরকের একটি রূপ।(মালফুযাত, খণ্ড ২, পৃ. ৪২০, সংস্করণ ২০২২)

অতএব আমাদের উচিত অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে নিজের আত্মসমালোচনা করা, যেন আমরা শিরক থেকে নিরাপদ থাকতে পারি। সে অনুযায়ী আমল করা এবং হৃদয়ে আল্লাহর প্রেম বৃদ্ধি করতে থাকা।

আরেক বর্ণনায় এ বিষয়টি আরও সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মাহমুদ বিন লাবীদ বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আমি তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি যে বিষয়ে ভয় করি তা হলো ছোট শিরক।" সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রসূল, ছোট শিরক কী?" তিনি বললেন, "রিয়া (দেখানো)। কিয়ামতের দিন আল্লাহ বলবেন: যাদের জন্য তোমরা দুনিয়ায় প্রদর্শনসুলভ আচরণ করেছিলে, তাদের কাছে যাও এবং দেখো, তাদের কাছে কোনো প্রতিদান পাও কি না।" তোমরা যেহেতু লোক দেখানোর জন্য কাজ করেছিলে, এখন তাদের কাছ থেকেই প্রতিদান নাও। (মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বল, হাদিস ২৪০৩০)

অতএব লোক দেখানো, কৃত্রিমতা ও প্রদর্শন আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অপছন্দনীয়; কারণ এ ধরনের আমল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়, বরং মানুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য করা হয়।

আমাদের নিজেদের আমল গভীরভাবে পর্যালোচনা করা উচিত। পরকালে কোনো সুপারিশ বা বাহ্যিক মাধ্যম এভাবে কাজে আসবে না। কেবল আল্লাহর অনুকম্পাই উপকারে আসবে। পবিত্র নবী (সা.)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করা, তাঁর আনুগত্য ও অনুকরণ করা-এগুলোই প্রকৃতপক্ষে উপকারী বিষয়, যেগুলো আল্লাহ নিজেই পছন্দ করেছেন। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন: فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ "অতএব তোমরা আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন।" (আলে ইমরান: ৩২)

আরেক হাদিসে হযরত আবু হুরায়রা (রাযি.) বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "আল্লাহ তাআলা তাঁর পথে যে ব্যক্তি বের হয়-শুধুমাত্র আমার প্রতি ঈমান ও আমার রসূলদের সত্যতা স্বীকারের কারণে-তার জন্য দায়িত্ব নিয়েছেন যে তিনি হয় তাকে প্রতিদান ও অর্জিত গনিমতসহ ফিরিয়ে দেবেন, অথবা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" অর্থাৎ হয় বিজয়, আর যদি শাহাদাত লাভ করে তবে জান্নাত-শর্ত হলো দৃঢ় ঈমান ও রসুলের সত্যতা স্বীকার করে বের হওয়া। তিনি আরও বলেন, "যদি আমি আমার উম্মতকে কষ্টে ফেলব বলে আশঙ্কা না করতাম, তবে কোনো অভিযানে পিছিয়ে থাকতাম না। আমার ইচ্ছা হয় যে আমি আল্লাহর পথে নিহত হই, তারপর জীবিত হই, আবার নিহত হই, আবার জীবিত হই, আবার নিহত হই।" (সহীহ আল-বুখারি, কিতাবুল ঈমান, হাদিস ৩৬)

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় হযরত সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ শাহ (রাযি.) লিখেছেন, নবী (সা.) যখন বললেন, অর্থাৎ, যদি এ আশঙ্কা না থাকত যে আমার উম্মত কষ্টে পড়বে, তবে আমি তা করতাম।" এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ ? অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন যে সাহাবায়ে কিরাম তাঁর অনুসরণে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। অধিকাংশ সাহাবাই তাঁর অনুসরণ করার জন্য গভীরভাবে উদ্‌গ্রীব ছিলেন-তাঁরা তাঁকে অনুসরণ করতে চাইতেন এবং বাস্তবেই তা করতেন।

তাঁর পবিত্র আদর্শে এমন শক্তিশালী আকর্ষণ ও প্রভাব ছিল যে ইবাদত-বন্দেগি পালন করার সময় স্বয়ং তিনি (সা.) তাঁর উম্মতের কথা মনে রাখতেন, যেন তাঁর কোনো আমল এমন রূপ না ধারণ করে যা তাদের জন্য অতিরিক্ত কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ, যদি তিনি প্রত্যেক বিষয়কে ফরজ করে দিতেন, তবে উম্মত কঠিনতায় পড়ে যেত। এ কারণেই তিনি (সা.) বলেছেন যে কখনো কখনো তিনি কিছু কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে পরিহার করতেন, যাতে তোমরা কষ্টে না পড়ো।

সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ শাহ সাহেব (রা.) আরও লিখেছেন: "পবিত্র নবী (সা.) আল্লাহ তা'আলার প্রতি গভীর ভালোবাসা পোষণ করতেন। এমনকি তাঁর বিরোধীরাও 'আশিকা মুহাম্মাদুন রব্বাহু' (মুহাম্মদ তাঁর রবের প্রেমে মগ্ন) কথায় সেই ভালোবাসারই উল্লেখ করত। কিন্তু এই প্রেমের পাশাপাশি তিনি নিজের নফসের উপর পূর্ণ সংযম বজায় রাখতেন এবং তাঁর বিবেক-বুদ্ধি এক মুহূর্তের জন্যও তাঁকে ছেড়ে যায়নি। যারা নিজেদের আমলে বাড়াবাড়ি করে, তাদের জন্য এতে একটি শিক্ষা রয়েছে। অন্ধভাবে আবেগের অনুসরণ করা পূর্ণ ঈমানের নিদর্শন নয়, আর তা কোনো উচ্চতর নেকির প্রমাণও নয়।"কিছু লোক বলে, "আমাদের গায়রাত আছে; আমাদের এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে।" কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মধ্যপন্থাকেই পছন্দ করেন। "মধ্যম পথের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকাই নেকির পরিপূর্ণতা, কারণ এর জন্য নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়।"

অতএব আল্লাহর প্রেমের সঙ্গে আত্মসংযম-দুটোকেই সামনে রেখে চলতে হবে; অন্ধভাবে নয়।

পবিত্র নবী (সা.) তাঁর জীবনের মাধ্যমে এমন উদাহরণ স্থাপন করেছেন, যেখানে আল্লাহর প্রেমের চরম প্রকাশ, ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার গভীরতা এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ বিদ্যমান-তবে সবই প্রজ্ঞা ও মধ্যপন্থার সঙ্গে, কারণ আল্লাহ নিজেই ভারসাম্যের নির্দেশ দিয়েছেন।

একটি বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.) মুশরিকদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করাকে অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে আল্লাহর রসুল (সা.) বদরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। তিনি যখন মদিনার প্রায় তিন মাইল পশ্চিমে অবস্থিত হাররাতুল ওবরায় পৌঁছান, তখন এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়, যিনি সাহস ও বীরত্বের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তাঁকে অত্যন্ত বীর ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হতো। রসুল (সা.)-এর সাহাবিগণ তাঁকে দেখে আনন্দিত হন এবং ধারণা করেন যে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য এসেছেন। লোকটি নবী (সা.)-এর কাছে এসে বলল, "আমি আপনার সঙ্গে যাওয়ার জন্য, সওয়াবে অংশীদার হওয়ার জন্য এবং আপনাকে সহায়তা করার জন্য এসেছি।" তখন আল্লাহর রাসুল (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো?"সে উত্তর দিল, "না।" তখন নবী (সা.) বললেন, "তাহলে ফিরে যাও; আমি কোনো মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করব না।" হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, সে ফিরে গেল। পরে তাঁরা যখন শাজারাহ নামক স্থানে পৌঁছান-যা মদিনা থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে অবস্থিত এবং সেখান থেকেই রাসুল (সা.) ইহরাম গ্রহণ করতেন-তখন সেই ব্যক্তি পুনরায় এসে আগের কথাই পুনর্ব্যক্ত করল। নবী (সা.) আবারও পূর্বের মতোই বললেন, "ফিরে যাও; আমি কোনো মূর্তিপূজকের সাহায্য গ্রহণ করব না।"

সে আবার ফিরে গেল। পরবর্তীতে সে যুলহুলাইফার পরবর্তী বাইদা নামক স্থানে, যা মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত, সেখানে এসে নবী (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। তখন নবী (সা.) পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো?"এবার সে বলল, "হ্যাঁ।" তখন আল্লাহর রাসুল (সা.) বললেন, "তবে এসো, এখন তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে পারো।" অতএব, পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, আল্লাহর প্রতি প্রেম ও তাঁর দ্বীনের প্রতি অনুরাগ এমন বিষয় সহ্য করতে পারে না যে কোনো মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করা হবে-বিশেষত এমন কাজে, যা একান্তভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর দ্বীনের জন্য সম্পাদিত হয়। (সূত্র:সহীহ মুসলিম, কিতাবুল জিহাদ, হাদিস নং ১৮১৭)।

হযরত মুসলে মওউদ (রা), বলেন: "পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে তাকাও-তাঁর আল্লাহ্? সম্বন্ধে জ্ঞান কত গভীর ছিল, তিনি কত সতর্ক ছিলেন এবং কী গভীরভাবে আল্লাহকে ভয় করতেন। যদিও তিনি সকল মানুষের চেয়ে অধিক পরিপূর্ণ ছিলেন, সকল প্রকার পাপ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র ছিলেন এবং স্বয়ং আল্লাহ্ই ছিলেন তাঁর রক্ষক ও অভিভাবক; তবুও এই পবিত্রতা ও মহিমার পরেও তিনি সর্বদা আল্লাহ্ ভীরু ছিলেন। তিনি একের পর এক সৎকর্ম এবং সর্বোচ্চ মানের পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতেন।"একটি নেক কাজের পর আরেকটি নেক কাজ করতেন; মন্দ কাজের প্রশ্নই উঠত না। সামান্যতম ছায়াও তাঁর মধ্যে ছিল না। তিনি সর্বদা ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তবুও তিনি ভয় করতেন-অত্যন্ত ভয় করতেন। নিজের পক্ষ থেকে যতটা সম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করতেন; কিন্তু যখন আল্লাহ্র অমুখাপেক্ষিতা ও মহিমা সম্পর্কে চিন্তা করতেন, তখন নিজের সমস্ত আমলকে তাঁর দরবারে তুচ্ছ মনে করে ইস্তিগফার করতেন। সুযোগ হলেই তওবা করতেন।

বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন যে, পবিত্র নবী (সা.) বলেছেন: "আল্লাহর কসম! আমি দিনে সত্তরেরও অধিকবার আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর দিকে ফিরে আসি।"

যুগ ইমামের বাণী

সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে সর্বোত্তম পন্থায় ঋণ পরিশোধ করে। (সহী মুসলিম, কিতাবুল মাসাকাত)

দোয়াপ্রার্থী: Jahan ara Begum, Bhagwangola, Murshdabad

(হযরত মুসলেহ মওউদ রচিত 'সীরাতুন নবী', খণ্ড-১, পৃ: ৮২)

আরবি ভাষায় "সত্তর"শব্দটি প্রায়শই অধিক বা অসংখ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়-অর্থাৎ তিনি দিনে অগণিতবার ইস্তিগফার করতেন।

আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর ভালোবাসার অবস্থা এমন ছিল যে, তাঁর পবিত্র জিহ্বা সর্বদা আল্লাহ্‌র যিকিরে সিক্ত থাকত।

(সুনান তিরমিযি, আবওয়াবুদ দাওয়াত, হাদিস ৩৩৮৪)

হযরত মুসলেহ মওউদ(রা)ও একথা বর্ণনা করেন আর হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর জিহ্বা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকরে সিক্ত থাকত।

হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বর্ণনা করেন, নবী (সা.) বলেছেন:

"চারটি বাক্য সমস্ত কথার চেয়ে উত্তম। তুমি যে কোনোটি দিয়ে শুরু করো, তাতে কোনো ক্ষতি নেই; বরং এগুলো অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ও বরকতময়।"

সেগুলো হলো. ১ নং -সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ্ পবিত্র ও সকল ত্রুটি থেকে মুক্ত) ২ নং-আলহামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য) ৩ নং. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই) ৪ নং. আল্লাহু আকবার (আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ) (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল আদাব, হাদিস ৩৮১১)

এই শব্দগুলো যদি মানুষের মনে সর্বদা থাকে এবং এ বিষয়গুলির প্রতি যত্নবান থাকে-কথা বলার সময় বা কাজ করার সময়ও-তবে এতে অসীম বরকত রয়েছে।

অনুরূপভাবে,আব্দুল্লাহ্ বিন বুসর (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) বর্ণনা করেন যে, একদা এক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল, "ইসলামের বিধি-বিধান ও সৎকর্মসমূহ আমার জন্য অত্যধিক হয়ে গেছে।" অর্থাৎ, আইন, নীতিমালা, নির্দেশ, আদেশ এবং নেক আমলের বিষয় এত অধিক যে, আমার মতো একজন মানুষের জন্য তা পালন করা দুরূহ বলে প্রতীয়মান হয়। বেদুঈনরা কখনও কখনও এ ধরনের সরল ও প্রত্যক্ষ প্রশ্ন উত্থাপন করত। অতএব সে অনুরোধ করল, "এসবের মধ্য থেকে আমাকে এমন একটি বিষয় বলে দিন, যা আমি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে পারি এবং বিশেষ যত্নসহকারে নিয়মিত পালন করতে পারি।"

রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উত্তরে বললেন, "তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর স্মরণে সিক্ত থাকে।" অর্থাৎ, তোমার জিহ্বাকে সর্বক্ষণ যিকরে ইলাহীতে ব্যস্ত রাখবে।

তিনি বলেন: লা ইয়াযালু লিসানুকা রাতবান মিন যিকরিল্লাহি 'আজ্জা ওয়া জাল্লা - "তোমার জিহ্বা যেন সদা-সর্বদা পরাক্রমশালী ও মহিমান্বিত আল্লাহর স্মরণে সিক্ত থাকে।" (সুনান ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আদব, হাদিস নং ৩৭৯৩)

অন্য এক বর্ণনায়, হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ (রাযিয়াল্লাহু 'আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"সর্বোত্তম যিকর হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এবং সর্বোত্তম দুআ হলো আলহামদুলিল্লাহ।"

(সুনান তিরমিযি, আবওয়াবুদ্ দা'ওয়াত, বাবু মা জা'আ আন্না দা'ওয়াতাল মুসলিমি মুস্তাজাবাহ, হাদিস নং ৩৩৮৩)

হযরত আবু উমামা (রা) বর্ণনা করেন, নবী (সা.) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তাঁর সামনে প্রস্তাব করেছিলেন-মক্কার উপত্যকাকে সোনায় পরিণত করে দেওয়া হবে। তিনি নিবেদন করলেন: "হে আমার প্রতিপালক! বরং এমন হোক যে, আমি একদিন পেটভরে খাই এবং একদিন ক্ষুধার্ত থাকি। যখন ক্ষুধার্ত থাকব, তখন তোমার কাছে কাকুতি-মিনতি করব ও তোমাকে স্মরণ করব; আর যখন পেটভরে খাব, তখন তোমার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব।"

(মুসনাদ আহমদ আহমদ বিন হাম্বল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪০২, হাদীস-২২৫৪৩)

আমি এগুলোর কামনা করি না। আমি চাই, সব সময় যেন তোমার স্মরণ হৃদয়ে থাকে। স্বর্ণ ও সম্পদের আধিক্য পাছে আমাকে তোমার স্মরণ থেকে বিচ্যুত করে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ব্যাখ্যা করেছেন যে, নবী করিম (সা.) যদি সরল জীবনযাপন করতেন বা কখনো আর্থিক সংকীর্ণতার মধ্যে থাকতেন, তা এ কারণে নয় যে আল্লাহ্ তাঁকে দেননি। আল্লাহ্ তাঁকে অঢেল দিয়েছিলেন; কিন্তু আল্লাহ্‌?র প্রেম ও স্মরণের জন্য তিনি বিনয়ী জীবন বেছে নিয়েছিলেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে তিনি নিয়মিত প্রত্যাখ্যান করতেন-তিনি উত্তম খাদ্য গ্রহণ করতেন এবং এর জন্য আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন।

(সূত্র: তাফসীরে হযরত মসীহ মওউদ, খণ্ড ৮, পৃ. ৪২-৪৩)

আরও বর্ণিত আছে, হযরত আবু বকরাহ (রা) বলেন-নবী (সা.) যখনই কোনো সুখবর পেতেন বা আনন্দের সংবাদ শুনতেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায়ের জন্য সিজদায় লুটিয়ে পড়তেন।

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামন-বাসনা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এটি এড়িয়ে চলা আবশ্যক।

(খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)

(সুনান আবু দাউদ, হাদিস ২৭৭৪)

আল্লাহ্ তা'লার সামনেই সকল কৃতজ্ঞতা আর তাঁর ভালবাসা ও প্রশংসা ও বন্দেগীর দাবি হল তাঁর সামনে নতজানু হওয়া এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা।

হযরত বারাআ ইবনে আজিব (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন-

"যখন তোমরা বিছানায় যাবে, তখন নামাজের জন্য যেভাবে অজু করো, সেভাবে অজু করবে-অর্থাৎ ঘুমানোর আগে অজু করা উত্তম। তারপর ডান কাতে শুয়ে এই দোয়াটি পড়বে। আমি এর অনুবাদ পাঠ করছি:

'হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করলাম। আমার সমস্ত কাজ তোমার নিকট সোপর্দ করলাম এবং তোমাকেই আমার ভরসা ও আশ্রয়রূপে গ্রহণ করলাম-তোমাকে ভয় করে এবং তোমাকে ভালোবেসে। তোমা ব্যতীত কোনো আশ্রয় নেই এবং কোনো মুক্তির স্থান নেই। মুক্তি একমাত্র তোমার কাছেই। আমি তোমার সেই কিতাবের প্রতি ঈমান আনলাম, যা তুমি অবতীর্ণ করেছ, এবং তোমার সেই নবীর প্রতি ঈমান আনলাম, যাকে তুমি প্রেরণ করেছ।'

নবী করিম (সা.) বলেন, 'এই দোয়াটি পড়বে। যদি সে রাতে তোমার মৃত্যু হয়, তবে তুমি ফিতরাতের উপর মৃত্যুবরণ করবে। অতএব এই কথাগুলোকে তোমাদের শেষ কথা বানাও (ঘুমানোর আগে)।'

বর্ণনাকারী বলেন, আমি নিবেদন করলাম, 'আমি এই কথাগুলো মুখস্থ করে নেব।' তারপর পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে বললাম: ***"ওয়া বি রাসূলিকা আল্লাযি আরসালত"*** (অর্থাৎ, এবং তোমার সেই রাসূলের প্রতি, যাকে তুমি পাঠিয়েছ)- এই শব্দগুলোও যোগ করলাম। তখন নবী (সা.) বললেন, 'না, বরং বলবে: ***ওয়া বি নাবিয়্যিকা আল্লাযি আরসালত*** (এবং তোমার সেই নবীর প্রতি, যাকে তুমি পাঠিয়েছ)।'

(সহীহ মুসলিম, কিতাবুদ দাওয়াত ও যিকর, হাদিস ৪৮৭০)

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা), বলেন-

"পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনোই মৃত্যুচিন্তা থেকে উদাসীন ছিলেন না। আল্লাহভীতি তাঁর অন্তরে এমনভাবে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল যে, তিনি প্রতিদিন এই বিশ্বাস নিয়ে নিদ্রায় যেতেন-সম্ভবত আজ রাত্রেই মৃত্যু আসতে পারে এবং তাঁকে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হতে হতে পারে। অতএব তিনি এমন এক পথিকের ন্যায় জীবনযাপন করতেন, যে মনে করে তার বাহন যে কোনো মুহূর্তে যাত্রা আরম্ভ করতে পারে। এ ধরনের পথিক এমন কোনো কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করে না, যা অসমাপ্ত রেখে ওঠা দুঃসাধ্য।"

যেমন কোনো ব্যক্তি যাত্রাবাহনে আরোহণের প্রতীক্ষায় সতর্ক থাকে, যেন তা তাকে রেখে না চলে যায়-তেমনি নবী (সা.) সর্বদা তাঁর প্রিয়তমের সান্নিধ্যে গমনের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। প্রতিটি অতিক্রান্ত শ্বাসকে তিনি আল্লাহর অনুগ্রহের ফল বলে মনে করতেন এবং সর্বদা মৃত্যুকে স্মরণে রাখতেন।

হযরত হুযাইফা ইবনে আল-ইয়ামান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অভ্যাস ছিল-তিনি যখন শয্যায় উপবেশন করতেন, তখন গালের নীচে হাত রেখে বলতেন:

"হে আমার প্রতিপালক! তোমারই নামে আমি মৃত্যু বরণ করি এবং তোমারই নামে জীবন লাভ করি।" আর নিদ্রা হতে জাগ্রত হলে বলতেন:

"সমস্ত প্রশংসা সেই প্রতিপালকের জন্য, যিনি আমাদের মৃত্যুর পর জীবন দান করেছেন; এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে।"

এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, তিনি প্রতি রাত্রে শয্যাগ্রহণের সময় নিজ জীবনের হিসাব সমাপ্ত বলে বিবেচনা করতেন এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতেন-যদি সে অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে, তবে তা যেন আল্লাহর নামেই সংঘটিত হয়। আর প্রভাতে জাগ্রত হয়ে তিনি আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন-এই উপলব্ধিতে যে, তাঁর নিজস্ব সামর্থ্যের দিক থেকে তিনি জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন; একমাত্র আল্লাহর কৃপায়ই পুনরায় জীবন লাভ করেছেন এবং তাঁর আয়ুতে বরকত সংযোজিত হয়েছে।

উপর্যুক্ত প্রার্থনা যেমন প্রমাণ করে যে, পবিত্র নবী (সা.) সর্বদা মৃত্যুকে স্মরণে রাখতেন, তেমনি নিম্নোক্ত প্রার্থনাও সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সম্ভাব্য শেষ মুহূর্ত বলে গণ্য করতেন। নিদ্রার পূর্বে তিনি তাঁর বিষয়সমূহ প্রতিপালকের নিকট সমর্পণ করতেন এবং যেকোনো পরিবর্তনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতেন।

এই প্রসঙ্গে হযরত বারা ইবনে আজিব (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী (সা.) শয্যায় শয়নকালে ডান পার্শ্বে শয়ন করতেন এবং বলতেন-

"হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার প্রাণ তোমার নিকট সমর্পণ করলাম। আমার সমগ্র মনোযোগ তোমার প্রতি নিবদ্ধ করলাম। আমার সকল বিষয় তোমার হাতে অর্পণ করলাম এবং তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করলাম। তোমার অনুগ্রহের প্রত্যাশী আমি, আবার তোমার মহিমা ও অমুখাপেক্ষিতার ভয়ে সন্ত্রস্ত। তোমার অসন্তোষ থেকে রক্ষার কোনো আশ্রয় বা মুক্তির স্থান নেই, একমাত্র তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা ব্যতীত। আমি সেই কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি, যা তুমি অবতীর্ণ করেছ; এবং সেই রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি, যাকে তুমি প্রেরণ

করেছ।" তিনি অন্যদের এ প্রার্থনা শিক্ষা দিতেন এবং নিজেও নিয়মিতভাবে তা পালন করতেন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা) লিখেছেন–

"মানুষ রাত্রে নিদ্রার পূর্বে নিজেদের ব্যবসায়িক হিসাব সমাপ্ত করে, কিন্তু আল্লাহর সঙ্গে নিজেদের হিসাব নিষ্পত্তি করে না। অথচ কী নির্বাচিত ছিলেন সেই মহান ব্যক্তি, যিনি প্রভাত থেকে সায়ংকাল পর্যন্ত আল্লাহর নিকট অর্পিত কর্তব্য সম্পাদনে নিয়োজিত থাকতেন–শুধু নিজে তা পালন করতেন না, বরং সহস্রাধিক মানুষের তত্ত্বাবধান করতেন তারা তাদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করছে কি না; তবুও রাত্রে নিদ্রার পূর্বে তিনি তাঁর সকল প্রচেষ্টা ও উপাসনাকর্ম থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বিনম্রচিত্তে প্রতিপালকের সম্মুখে এমনভাবে দাঁড়াতেন, যেন তিনি কোনো সেবাই সম্পাদন করেননি। যতক্ষণ না তিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁর প্রাণ আল্লাহর নিকট সমর্পণ করতেন, জগত ও জগতের অন্তর্ভুক্ত সকল বিষয় থেকে নিজেকে বিযুক্ত ঘোষণা করতেন এবং প্রতীকী অর্থে আল্লাহর হাতে নিজের হাত অর্পণ করতেন–ততক্ষণ তিনি নিদ্রা গ্রহণ করতেন না।"

(সীরাতুন্নবী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮৩–৮৫)

বর্ণিত আছে যে হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে প্রেরিত বর্ণনায় বলা হয়েছে–আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"ফজরের নামাজের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত যারা আল্লাহকে স্মরণ করে তাদের সঙ্গে বসে থাকা আমার নিকট অধিক প্রিয়, ইসমাঈল (আ.)–এর বংশধরদের মধ্য থেকে চারজন দাসকে মুক্ত করার চেয়েও। আর আসরের নামাজের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত যারা আল্লাহকে স্মরণ করে তাদের সঙ্গে বসে থাকা আমার নিকট অধিক প্রিয়, চারজন দাস মুক্ত করার চেয়েও।"

(সুনান আবি দাউদ, হাদিস নং ৩৬৬৭)

আল্লাহর প্রতি গভীর প্রেমের কারণেই তিনি আল্লাহকে ভালোবাসে ও তাঁকে স্মরণ করে–এমন ব্যক্তিদেরকে ইসমাঈল (আ.)–এর বংশধরদের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন; যদিও তারা তাঁর নিকটাত্মীয় ও স্বজন। ঐ সকল মানুষের দাসত্ব সহ্য করা সম্ভব ছিল, কিন্তু যে সমাবেশে আল্লাহর স্মরণ হয়, সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা তাঁর পক্ষে অসহনীয় ছিল। কোথাও যদি আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর প্রেমের আলোচনা চলমান থাকে, আর তিনি সেই সমাবেশে উপস্থিত না থাকেন–এমনটি কীভাবে সম্ভব হতে পারে?

কী অনুপম ঈশ্বরপ্রেমের অবস্থা–যে প্রেম তিনি অন্যদের মধ্যে সঞ্চারিত করছিলেন, তা তাঁর নিজের অন্তরে চূড়ান্ত উচ্চতায় উপনীত হয়েছিল।

অনুসারীদেরকে সর্বদা আল্লাহর প্রেম ও স্মরণে নিমগ্ন থাকার উপদেশ দিয়ে তিনি বলেন:

"আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় কর্ম হলো–তোমাদের মৃত্যু এমন অবস্থায় আসুক, যখন তোমাদের জিহ্বা তাঁর স্মরণে সিক্ত থাকে।"

(আল-জামি' আস-সাগীর, ইমাম সুয়ূতি সংকলিত, হাদিস নং ১৯৮)

আরও বর্ণিত আছে যে হযরত আবু আদ্-দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত–নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"আমি কি তোমাদের এমন এক কর্ম সম্পর্কে অবহিত করব না, যা সকল কর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তোমাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে সর্বাধিক পবিত্র, মর্যাদা উন্নতিতে সর্বোচ্চ, স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করার চেয়েও উত্তম, এমনকি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তোমরা তাদের ঘাড়ে আঘাত করবে এবং তারা তোমাদের ঘাড়ে আঘাত করবে–এ অবস্থার চেয়েও শ্রেয়? সাহাবিগণ (রা.) বললেন, "নিশ্চয়ই।"

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: "তা হলো আল্লাহর স্মরণ।"

অতএব, আল্লাহর স্মরণ এমন সকল সংগ্রামের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

হযরত মু'আয ইবন জাবাল (রা.) বর্ণনা করেন–নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"আল্লাহর শাস্তি থেকে মানুষকে মুক্তি দেয়–এমন কোনো বিষয় আল্লাহর স্মরণের চেয়ে অধিক কার্যকর নয়।" (সুনান ইবন মাজাহ, হাদিস নং ৩৭৯০)

আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে মানুষ বহু পরিণাম ও শাস্তি থেকে রক্ষা পায়।

আল্লাহর প্রতি গভীর প্রেমের কারণেই নিরবচ্ছিন্ন স্মরণ নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ছিল।

এ প্রসঙ্গে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত–আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

"আমি বলি–সুবহানাল্লাহ (আল্লাহ পবিত্র), আলহামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর), লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নেই), আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ)–এগুলি আমার নিকট সূর্য যে সকল বস্তুর উপর উদিত হয়, তার সবকিছুর চেয়েও অধিক প্রিয়।" (সহিহ মুসলিম, হাদিস নং ৪৮৪৭)

এই ছিল ঐশী প্রেমের সেই গভীর আকর্ষণ, যার ফলে জীবনের অন্তিম মুহূর্তেও তাঁর পবিত্র জিহ্বায় উচ্চারিত হচ্ছিল সেই পরম প্রিয় সত্তার নাম।

এ কারণেই হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেন যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুস্থ অবস্থায় প্রায়ই বলতেন–

"কোনো নবী ইন্তেকাল করেন না, যতক্ষণ না তাঁকে জান্নাতে তাঁর অবস্থানস্থল দেখানো হয়। কোনো নবী মৃত্যুবরণ করেন না, যতক্ষণ না তিনি জান্নাতে তাঁর নির্ধারিত স্থান প্রত্যক্ষ করেন। তারপর তাঁকে নির্বাচন করার সুযোগ প্রদান করা হয়।" হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, যখন তিনি সুস্থাবস্থায় এ কথা বলেছিলেন যে নবীকে জান্নাত দেখানো হয় এবং তারপর তাঁকে নির্বাচনাধিকার দেওয়া হয়–পরবর্তীকালে যখন তাঁর ইন্তেকালের সময় নিকটবর্তী হলো এবং তাঁর পবিত্র মস্তক আমার উরুর উপর ছিল, তখন তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। এরপর তাঁর চেতনা ফিরে এলে তিনি গৃহের ছাদের দিকে দৃষ্টি উত্তোলন করেন এবং উচ্চারণ করেন:

"হে আল্লাহ, পরম সঙ্গী' আমি তখন বললাম, এ উক্তি থেকে তো প্রতীয়মান হচ্ছে যে এখন আপনি আমাদেরকে আর নির্বাচন করবেন না; আপনি আল্লাহর সান্নিধ্যের দিকেই গমন করছেন। তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে, এটি সেই কথাই যা তিনি সুস্থাবস্থায় আমাদের নিকট বর্ণনা করতেন–অর্থাৎ যখন নির্বাচনাধিকার প্রদান করা হয়, তখন তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যকেই বেছে নেন।

হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর সর্বশেষ উচ্চারিত বাক্য ছিল: "হে আল্লাহ, পরম সঙ্গী।"

(সহিহ বুখারি, খণ্ড ৯, পৃ. ৩৫১, কিতাবুল মাগাজি, 'নবীর শেষ উক্তি' অধ্যায়, হাদিস নং ৪৪৬৩)

হযরত আয়িশা (রা.) অন্য এক বর্ণনায় বলেন:

"আল্লাহ আমার প্রতি যে সকল অনুগ্রহ করেছেন, তার মধ্যে একটি হলো–আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার গৃহে, আমার নির্ধারিত দিবসে, এবং আমার বক্ষ ও কণ্ঠাস্থির মধ্যবর্তী স্থানে ইন্তেকাল করেছেন। আর তাঁর ইন্তেকালের সময় আল্লাহ আমার লালা ও তাঁর লালাকে একত্রিত করেছিলেন।"

তিনি বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করেন:

"আবদুর রহমান আমার কাছে এলেন। তাঁর হাতে একটি মিসওয়াক ছিল। আমি তখন আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–কে সমর্থন দিয়ে ধরে রেখেছিলাম। আমি লক্ষ্য করলাম, তিনি মিসওয়াকটির দিকে তাকাচ্ছেন। আমি জানতাম যে তিনি মিসওয়াক পছন্দ করতেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমি কি এটি আপনার জন্য নিয়ে নেব?' তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন। আমি তা তাঁকে দিলাম, কিন্তু সেটি তাঁর জন্য শক্ত মনে হলো। তখন আমি বললাম, 'আমি কি এটি আপনার জন্য নরম করে দেব?' তিনি আবার মাথা নেড়ে সম্মতি দিলেন। অতঃপর আমি তা নরম করলাম।"

তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, তিনি তা চিবিয়ে নরম করেছিলেন। তাঁর সম্মুখে একটি ছোট পাত্র ছিল–অথবা সম্ভবত একটি বড় পাত্র (পাত্রের আকার সম্পর্কে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে)–যাতে পানি ছিল। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাতে তাঁর হাত ডুবিয়ে সেই পানি দিয়ে তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল মুছছিলেন এবং বলছিলেন:

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। নিশ্চয়ই মৃত্যুর যন্ত্রণা রয়েছে।"

(আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য নেই। নিশ্চয়ই মৃত্যুর কষ্ট আছে।)

এরপর তিনি তাঁর হাত উত্তোলন করে বলতে শুরু করলেন: "ফির রফীকুল আ'লা।" (পরম সঙ্গীর নিকট।)

এভাবেই তিনি উচ্চারণ করতে থাকলেন, অবশেষে তিনি ইন্তেকাল করলেন এবং তাঁর হাত নত হয়ে পড়ল।

(সহিহ বুখারি, কিতাবুল মাগাজি, 'নবীর অসুস্থতা ও ইন্তেকাল' অধ্যায়, হাদিস নং ৪৪৪৯)

হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাতু ওয়াস্ সালাম) বলেন:

"আঁ হজরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–কে পরমেশ্বর শেষ সময়ে স্বাধীন নির্বাচনাধিকার প্রদান করেছিলেনচ–অর্থাৎ তাঁকে বিকল্প দেওয়া হয়েছিল–"যদি আপনি ইচ্ছা করেন তবে পৃথিবীতে অবস্থান করুন, আর যদি ইচ্ছা করেন তবে আমার নিকট আগমন করুন।" তিনি নিবেদন করেছিলেন, "হে আমার প্রতিপালক, এখন আমি এটিই কামনা করি যে আপনার নিকট উপস্থিত হই।" এবং তাঁর পবিত্র প্রাণ যে শেষ বাক্যের উপর বিদায় নিয়েছিল, তা ছিল–"বি-'রফীকুল আ'লাচ; অর্থাৎ, "এ স্থানে আর অবস্থান করতে চাই না; আমি আমার পরমেশ্বরের নিকট যেতে চাই।"

(নূরুল কুরআন, নং ২; রূহানী খাজায়েন, খণ্ড ৯, পৃ. ৪১১)

আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে এই স্বাধীনতা দিয়েছিলেন যে, যদি তিনি জীবন অব্যাহত রাখতে চান তবে তাও সম্ভব। কিন্তু তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি আর এই পৃথিবীতে অবস্থান করতে ইচ্ছুক নন। অতএব তিনি আল্লাহ্‌র তা'লার সান্নিধ্যে উপস্থিত হলেন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

(আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ২০ জানুয়ারী, ২০২৬(

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর মকাম ও মর্যাদা

মুনীর আহমদ খাদিম, সম্পাদক বদর পত্রিকা (উর্দু)

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○ هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○ وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

অনুবাদ: আকাশসমূহে যাহা কিছু আছে এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সকলেই আল্লাহ্‌র তসবীহ (পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা) করিতেছে, যিনি সর্বাধিপতি, অতীব পবিত্র, মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

তিনিই উম্মীদের মধ্যে তাহাদেরই মধ্য হইতে এক রসুল আবির্ভূত করিয়াছেন, যে তাহাদের নিকট তাঁহার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে, এবং তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করে, এবং তাহাদিগকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, যদিও পূর্বে তাহারা প্রকাশ্য ভ্রান্তির মধ্যে ছিল; এবং (তিনি তাহাকে আবির্ভূত করিবেন) তাহাদের মধ্য হইতে অন্য লোকদের মধ্যেও যাহারা এখন পর্যন্ত তাহাদের সঙ্গে মিলিত হয় নাই। এবং তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

ইহা আল্লাহ্‌র ফযল, তিনি যাহাকে চাহেন ইহা দান করেন, এবং আল্লাহ্ পরম ফযলের অধিকারী।

(সূরা জুমআ, আয়াত: ১-৪)

সম্মানিত সভাপতি মহোদয় এবং শ্রদ্ধেয় শ্রোতৃবৃন্দ, আমি এইমাত্র পবিত্র কুরআনের যে কয়েকটি মহিমান্বিত আয়াত তিলাওয়াত করেছি - প্রকৃতপক্ষে এই আয়াতসমূহই আমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু। আপনারা যেমনটি শুনেছেন, আমাকে হযরত মসীহ মওউদ, হযরত মির্জা গুলাম আহমদ (আলাইহিস সালাম)-এর মকাম ও মর্যাদা (আধ্যাত্মিক অবস্থান ও স্তর) সম্পর্কে কিছু কথা উপস্থাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এবং মহানবী (সা.)-এর একটি হাদিস উদ্ধৃত করে হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) বলেন:

"সহীহ হাদিসে বর্ণিত আছে যে, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সালমান আল-ফারসীর পিঠে তাঁর হাত রেখে বললেন: 'যদি ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রপুঞ্জে ঝুলে যায়, তবে পারস্যের একজন ব্যক্তি তা ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।'"(সহীহ আল-বুখারি)

এবং আমার সম্পর্কেই একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, যেমনটি আল্লাহ্ তা'আলা 'বারাহীন-এ-আহমদিয়া' গ্রন্থে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রতিষ্ঠা করেছেন। একই হাদিস আমার উপর ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছিল, এবং আমার পূর্বে এর পরিপূর্ণতার জন্য নির্দিষ্টভাবে কাউকে চিহ্নিত করা হয়নি। আল্লাহ্‌র ওহীই আমাকে সেই ব্যক্তি হিসেবে নির্ধারণ করেছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য।"

(হাকীকতুল ওহী, পৃ. ৩৯১, টীকা)

তিনি আরও বলেন:

"'পারস্যের ব্যক্তি' এবং 'প্রতিশ্রুত মসীহ'-এই দুটি একই ব্যক্তির নাম। যেমন পবিত্র কুরআনে ইঙ্গিত করা হয়েছে এই আয়াতে: 'এবং তাদের মধ্য থেকে অন্য এক জাতি, যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি' (৬২:৪)। অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীদের মধ্য থেকে আরেকটি দল রয়েছে, যারা এখনো আত্মপ্রকাশ করে নি।"

এটি সুস্পষ্ট যে 'সাহাবী' শব্দটি প্রকৃতপক্ষে তাঁদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যারা নবীর যুগে জীবিত ছিলেন, ঈমান গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর সান্নিধ্যে থেকে শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ লাভ করেছিলেন। সুতরাং এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পরবর্তী যুগে এমন এক নবীর আবির্ভাব হবে, যিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি প্রতিচ্ছবি (বুরুজ) হবেন। অতএব, তাঁর অনুসারীরাও রাসূলুল্লাহর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবেন।

যেমন প্রাথমিক সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) তাঁদের আধ্যাত্মিক সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহ্‌র পথে অসামান্য সেবা প্রদান করেছিলেন, তেমনি পরবর্তী যুগের এই অনুসারীরাও তাঁদের নিজস্ব আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অনুরূপ সেবা সম্পাদন করবেন। সারসংক্ষেপে, এই আয়াত শেষ যুগে এক নবীর আবির্ভাব সম্পর্কে একটি ভবিষ্যদ্বাণী। অন্যথায়, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরে জন্মগ্রহণকারী এবং তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে না-দেখা ব্যক্তিদের 'রসূলের সাহাবী' বলে আখ্যায়িত করার কোনো যৌক্তিকতা থাকত না।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, আয়াতে বলা হয়নি "উম্মতের মধ্য থেকে অন্যরা; বরং বলা হয়েছে "তাদের মধ্য থেকে অন্যরা।" এখানে মিনহুম ("তাদের মধ্য থেকে) সর্বনামটি স্পষ্টত সাহাবীদের দিকেই ইঙ্গিত করে। অতএব, কেবল সেই দলই মিনহুম-এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যাদের মধ্যে এমন একজন রসূল থাকবেন, যিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর প্রতিচ্ছবি (বুরুজ)। (তাতিম্মা হাকীকতুল ওহী)

সম্মানিত শ্রোতৃবৃন্দ, প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম) পবিত্র কুরআনের আয়াত "ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম"(৬২:৪)-এর ব্যাখ্যায়, সহীহ আল-বুখারির উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিপূর্ণ প্রতিবিম্ব (জিল্লে কামিল) এবং ছায়ানবী (জিল্লী নবী)।

এই বক্তব্য কেবল প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম) একাই প্রদান করেননি; বরং মুসলিম উম্মাহর পূর্ববর্তী বুজুর্গরাও প্রতিশ্রুত মসীহের আধ্যাত্মিক অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে অনুরূপ ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ, হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী লিখেছেন:

অর্থাৎ, মর্যাদার দিক থেকে সর্বোচ্চ নবী সেই, যার দ্বিতীয় একটি আবির্ভাবও অন্তর্ভুক্ত থাকে-দ্বিতীয় আবির্ভাব বলতে আল্লাহ্ তা'লার অভিপ্রায় হল , তিনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পরিচালিত করবেন এবং যার উম্মত মানবজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে আত্ম প্রকাশ করবে যাদেরকে সকলের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব, নবীর প্রথম আবির্ভাব দ্বিতীয় আবির্ভাবের ভিত্তি স্থাপন করে এবং তার সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত থাকে।

(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, খণ্ড ১, অধ্যায় "হাকীকাতুন নবুওয়াতচ, মিসর সংস্করণ, পৃ. ৮৩)

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী তাঁর গ্রন্থ আল-খায়রুল কাসীর-এ প্রত্যাশিত ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহের মর্যাদা ও অবস্থান প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন:

حَقٌّ لَهُ أَنْ يَنْعَكِسَ فِيهِ أَنْوَارُ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَزْعَمُ الْعَامَّةُ أَنَّهُ إِذَا نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ كَانَ وَاحِدًا مِنَ الْأُمَّةِ كَلَّا بَلْ هُوَ شَرْحٌ لِلِاسْمِ الْجَامِعِ الْمُحَمَّدِيِّ وَنُسْخَةٌ مُنْتَسِخَةٌ مِنْهُ فَشَتَّانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْأُمَّةِ "

অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদিয়ায় আগমনকারী ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদের এ অধিকার রয়েছে যে তাঁর মধ্যে সাইয়্যিদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নূরের প্রতিফলন থাকবে। সাধারণ মানুষ মনে করে থাকেন যে তিনি যখন আগমন করবেন, তখন কেবলমাত্র একজন উম্মত হিসেবেই আসবেন-এটি মোটেই সঠিক নয়। বরং তিনি তো ইসমে জামি' মুহাম্মদীর পূর্ণ ব্যাখ্যা হবেন এবং তাঁরই সত্যিকারের প্রতিচ্ছবি হবেন। অতএব তাঁর সঙ্গে একজন সাধারণ উম্মতের মধ্যে এক বিশাল পার্থক্য থাকবে।

হযরত ইমাম আবদুর রাজ্জাক কাশানী রহমতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি বলেন:

اَلْمَهْدِيُّ الَّذِي يَجِيئُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ تَابِعًا لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْمَعَارِفِ وَالْعُلُومِ وَالْحَقِيقَةِ تَكُونُ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ تَابِعِينَ لَهُ كُلُّهُمْ .... لِأَنَّ بَاطِنَهُ بَاطِنُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ শেষ যুগে আগমনকারী মাহদী শরীয়তের বিধানাবলীতে হযরত মুহাম্মদ, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর অনুসারী হবেন। কিন্তু জ্ঞান, আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা ও হাকীকতের ক্ষেত্রে-হযরত মুহাম্মদ (সা.) ব্যতীত সকল নবী ও ওলী তাঁর অধীন হবেন। কারণ মাহদীর অন্তঃসত্তা (বাতিন) মূলত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এরই অন্তঃসত্তা।

সুতরাং আগত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদের প্রকৃত মর্যাদা এই যে, তিনি হচ্ছেন মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ বুরূয কামিল (সম্পূর্ণ প্রতিফলন)। অতএব এই পূর্ণ প্রতিফলন পূর্ববর্তী নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী এবং দুই জগতের নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যথাযথভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

এই প্রতিফলন প্রকাশিত হয়েছিল কাদিয়ানের হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আলাইহিস সালাম)-এর পবিত্র সত্তায়। তিনি তাঁর দাবিকে পরম পবিত্র ও মহিমান্বিত আল্লাহ্ তাআলার দিকে সম্বন্ধিত করে ঘোষণা করেন:

"তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর বিশেষ ওহীর মাধ্যমে আমার ওপর প্রকাশ করেছেন যে মসীহ ইবনে মরিয়ম ইন্তেকাল করেছেন। সুতরাং তাঁর ওহী এই যে: 'মসীহ ইবনে মরিয়ম, আল্লাহর রসূল, মৃত্যুবরণ করেছেন; আর তাঁর রঙে রঞ্জিত হয়ে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তুমি আগমন করেছ।' আর আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ হওয়ার ছিল। তুমি আমার সঙ্গে আছো, তুমি স্পষ্ট সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তুমি সাহায্যপ্রাপ্ত এবং তুমি সঠিক পথের উপর আছো।"

(ইযালা আউহাম, পৃ. ৩০২)

তিনি আরও বলেন:

"ঐশী ওহীর মাধ্যমে আমার ওপর

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সদকা কখনও কারো সম্পদ হ্রাস করে নি আর আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা দানের কারণে বান্দার সম্মান বৃদ্ধিই করে থাকেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুর বির ওয়াসসিলাহ ওয়াল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and family, Barisha (Kolkata)

সুস্পষ্টভাবে উন্মোচিত হয়েছে যে, যে মসীহ উম্মতের জন্য আদিকাল থেকেই প্রতিশ্রুত ছিলেন এবং যে শেষ মাহদী ইসলামের অবনতি ও ভ্রষ্টতার বিস্তারের সময়ে সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে হেদায়েতপ্রাপ্ত হবেন এবং ঐ ঐশী খাদ্য-সম্ভার নবরূপে মানবজাতির কাছে উপস্থাপন করবেন, তিনি খোদার ভিধান অনুযায়ঢ নিযুক্ত হয়েছেন। আজ হতে তেরশত বৎসর পূর্বে রসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাঁর সুসংবাদ তেরশো বছর পূর্বে মহান রাসূল (সা.) প্রদান করেছিলেন, সেই ব্যক্তি আমিই। ঐশী বাক্যালাপ ও রহমান খোদার সম্ভাষণ এত স্পষ্টরূপে ও অজস্র ধারায় অবতীর্ণ হয়েছে যে সন্দেহ ও সংশয়ের কোনো অবকাশ অবশিষ্ট নেই। প্রত্যেকটি ওহী যেন লৌহ-শলাকার ন্যায় আমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হচ্ছিল এবং এই সমস্ত ঐশী বাক্যালাপ এরূপ মহান ভবিষ্যদ্বাণীতে পরিপূর্ণ ছিল যে, এইগুলি দিবালোকের ন্যায় পূর্ণ হচ্ছিল। এগুলোর ধারাবাহিকতা, প্রাচুর্য এবং অলৌকিক শক্তির প্রভাব আমাকে একথা স্বীকার করতে বাধ্য করেছে যে এটি সেই এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর বাণী, যার বাণী হলো পবিত্র কুরআন।"

(তাযকিরাতুশ্-শাহাদাতাইন, পৃ. ১-২, ২২)

সম্মানিত শ্রোতৃবৃন্দ! মসীহ মওউদ (আ.) ব্যাখ্যা করেছেন যে, কুরআনের আয়াত-"এবং তাদের মধ্য হতে অন্যদের জন্যও, যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয় নি" (৬২:৪)-অনুসারে তিনি মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ প্রতিফলন। সুতরাং তাঁর যুগে মহানবী (সা.)-এর মুজিযাসমূহ বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হবে। বাস্তবিকই তাঁর যুগে মহানবী (সা.)-এর বরকতময় মুজিযা বৃষ্টির মতো প্রকাশিত হয়েছে, যা তাঁর সত্যতার এক বিরাট প্রমাণ।

তিনি বললেন: এই আয়াতের অর্থ হলো-চরম বিভ্রান্তি ও অন্ধকারের পর যারা হেদায়াত ও প্রজ্ঞা লাভ করেছে এবং পবিত্র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মু'জিজা ও বরকত প্রত্যক্ষ করেছে, তারা কেবল দুইটি দল। প্রথম দল হলো পবিত্র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণ, যারা তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে তারা নবুওয়তের যুগ লাভ করে, নিজ চোখে মু'জিজাসমূহ প্রত্যক্ষ করে এবং ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর পরিপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করে। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও দৃঢ় বিশ্বাস তাদের মধ্যে এমন এক বিপ্লব সৃষ্টি করে যে, যেন তারা এক প্রাণে পরিণত হয়েছিল।

দ্বিতীয় দল, যা উল্লিখিত আয়াত অনুযায়ী সাহাবীদের সদৃশ, তা হলো প্রতিশ্রুত মসীহের জামাআত। কারণ এই দলও সাহাবীদের ন্যায় মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মু'জিজাসমূহ প্রত্যক্ষকারী এবং অন্ধকার ও বিভ্রান্তির পর হেদায়াতপ্রাপ্ত। আর "আখারীনা মিনহুম"("তাদের মধ্য হতে অপর একটি দল) আয়াতে এই দলকে "মিনহুম"শব্দের মাধ্যমে সাহাবীদের সদৃশ হওয়ার যে নেয়ামত প্রদান করা হয়েছে, তা এ বিষয়ে ইঙ্গিত করে যে, যেমন সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মু'জিজাসমূহ প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর সাক্ষী হয়েছিলেন, তেমনি এই দলও তা প্রত্যক্ষ করবে। মধ্যবর্তী যুগ এই নেয়ামতে পূর্ণভাবে অংশীদার হবে না।

অতএব, এ যুগে বিষয়টি ঠিক এভাবেই সংঘটিত হয়েছে: তেরশত বছর পর পুনরায় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মু'জিজার দরজা উন্মুক্ত হয়েছে এবং মানুষ নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছে যে রমযান মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়েছে-যা দার কুতনীর হাদীস এবং ইবন হাজারের ফতোয়াসমূহ অনুযায়ী ছিল। অর্থাৎ রমযান মাসেই চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়। এবং হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী চন্দ্রগ্রহণ তার সম্ভাব্য রাতগুলোর প্রথম রাতে এবং সূর্যগ্রহণ তার সম্ভাব্য দিনগুলোর মধ্যবর্তী দিনে সংঘটিত হয়। এই ঘটনা এমন সময়ে সংঘটিত হয়, যখন মাহদী হওয়ার দাবিদার উপস্থিত ছিলেন। আসমান ও জমিন সৃষ্টির পর থেকে এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি; কারণ আজ পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় এর দৃষ্টান্ত কেউ প্রমাণ করতে পারেনি। অতএব এটি পবিত্র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এক মু'জিজা ছিল, যা মানুষ নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছে।

পুনরায় "যুল-সিনাইন"নামক নক্ষত্র, যার আবির্ভাব মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহের যুগে হবে বলে বর্ণিত ছিল, হাজারো মানুষ তা উদিত হতে দেখেছে। তদ্রূপ জাভার অগ্নিকাণ্ড লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে। অনুরূপভাবে প্লেগের প্রাদুর্ভাব এবং হজ থেকে বিরত থাকা-এসব ঘটনাও সকলেই নিজ চোখে দেখেছে। দেশে রেলপথের প্রচলন, উটের অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়া-এসবই পবিত্র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মু'জিজাসমূহ, যা এই যুগে ঠিক তেমনিভাবে দেখা গেছে, যেমন সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) মু'জিজাসমূহ দেখেছিলেন। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা এই শেষ যুগের দলকে "মিনহুম"বলে সম্বোধন করেছেন-যাতে ইঙ্গিত করা হয় যে মু'জিজা প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে তারাও সাহাবীদেরই রঙে রঞ্জিত।

চিন্তা করে দেখ-তেরশত বছরে নবুওয়তের আদর্শে এমন যুগ আর কে লাভ করেছে? যে যুগে আমাদের এই জামাআত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বহু বিষয়ে তা সাহাবীগণের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। তারা নিদর্শন ও মু'জিজাসমূহ প্রত্যক্ষ করে, যেমন সাহাবীরা করেছিলেন। তারা আল্লাহ্? তা'আলার নিদর্শন ও সদা-নবায়িত তায়ীদ থেকে নূর ও দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করে, যেমন সাহাবীরা অর্জন করেছিলেন। তারা আল্লাহর পথে উপহাস, বিদ্রূপ, অভিশাপ, বিভিন্ন প্রকার কটু বাক্য, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকরণ এবং নানাবিধ কষ্ট সহ্য করে, যেমন সাহাবীরা সহ্য করেছিলেন। তারা আল্লাহর প্রকাশ্য নিদর্শন, আসমানি সাহায্য ও প্রজ্ঞাময় শিক্ষার মাধ্যমে পবিত্র জীবন লাভ করছে, যেমন সাহাবীরা লাভ করেছিলেন।

তাদের মধ্যে অনেকে নামাজে অশ্রুপাত করে এবং সিজদার স্থান অশ্রুতে ভিজিয়ে দেয়, যেমন সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) কাঁদতেন। তাদের মধ্যে অনেকে সত্য স্বপ্ন দেখে এবং ইলহামে ইলাহী দ্বারা সম্মানিত হয়, যেমন সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) হতেন। তাদের মধ্যে অনেকে নিজেদের কঠোর পরিশ্রমে উপার্জিত সম্পদ কেবল আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য আমাদের এই সিলসিলার খাতে ব্যয় করে, যেমন সাহাবীগণ (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) ব্যয় করতেন। তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা মৃত্যুকে স্মরণ রাখে, যাদের অন্তর কোমল এবং যারা সত্যিকারের তাকওয়ার উপর দৃঢ়পদে অগ্রসর হয়, যেমন ছিল সাহাবীগণের চরিত্র।

তারা আল্লাহর দল-যাদেরকে আল্লাহ্ স্বয়ং রক্ষা করছেন, প্রতিদিন তাদের হৃদয় পরিশুদ্ধ করছেন, তাদের বক্ষ ঈমানজাত প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ করছেন এবং আসমানি নিদর্শনের মাধ্যমে তাদেরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করছেন, যেমন তিনি সাহাবীদের আকৃষ্ট করেছিলেন। সংক্ষেপে, "আখারীনা মিনহুম" শব্দযুগল থেকে যে সমস্ত লক্ষণ বোঝা যায়, তা এই জামাআতের মধ্যে বিদ্যমান। আর এটি আল্লাহ্ তা'আলার বাণী যা একদিন পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল।

(আইয়্যামুস-সুলহ, সূরা আল-জুমুআর তাফসির, পৃষ্ঠা ১২৮-১২৯)

প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী মাওউদ (আলাইহিস সালাম), পবিত্র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তাঁর পূর্ণ প্রতিফলন (বুরূজে কামিল) হওয়ার অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে "আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম" আয়াতের তাৎপর্য হলো:

"আমাদের খাঁটি ও পরিপূর্ণ বান্দাগণ কেবল সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নন; বরং তাঁদের পাশাপাশি আরও এমন এক বৃহৎ দল রয়েছে, যারা শেষ যুগে আবির্ভূত হবে। এবং যেমন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীগণ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর তরবিয়ত করেছিলেন, তেমনিভাবে পবিত্র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এই দলটিরও আভ্যন্তরীণভাবে তরবিয়ত করবেন। অর্থাৎ তারা এমন এক সময়ে আবির্ভূত হবে, যখন বাহ্যিক উপকার লাভ ও উপকার প্রদানের শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, যখন ইসলাম ধর্ম বহু ভ্রান্তি ও বিদ'আতে পূর্ণ হয়ে পড়বে এবং এমনকি সাধকদের অন্তর থেকেও আধ্যাত্মিক আলো লোপ পাবে। তখন আল্লাহ্? তা'আলা এক সৌভাগ্যবান ব্যক্তিকে উত্তোলন করবেন এবং বাহ্যিক শৃঙ্খল ও প্রথাগত পদ্ধতির মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে কেবল নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রূহানী তরবিয়তের মাধ্যমে তাকে আধ্যাত্মিক পূর্ণতার শিখরে উপনীত করবেন। অতঃপর তাঁকে এক বৃহৎ জামাআতে পরিণত করবেন। আর সেই জামাআত সাহাবীদের জামাআতের সঙ্গে অত্যন্ত গভীর সাদৃশ্য অর্জন করবে; কারণ তারা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এরই চাষাবাদ হবে এবং তাঁর ফয়েজ তাদের মধ্যে প্রবাহমান ও কার্যকর থাকবে।"

(আইনাহ কামালাতে ইসলাম, সূত্র: তফসীর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সূরা আল-জুমুআর তাফসির)

সম্মানিত শ্রোতৃবৃন্দ! ইমাম মাহদী ও মসীহ মাও'উদের মহান মর্যাদার আরেক প্রমাণ এই যে, প্রতিকূল ও কঠিন বিরোধিতার পরিবেশেও মহানবী (সা.) নির্দেশ দিয়েছেন-তাঁর প্রতি সালাম পৌঁছে দিতে এবং তাঁর হাতে বাইআত করতে। অতএব তিনি বলেছেন:

اَلَا إِنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ وَلَا رَسُولٌ انَّهُ خَلِيفَتِي فِي أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي، اَلَا إِنَّهُ يَقْتُلُ الدَّجَّالَ وَيَكْسِرُ الصليب وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَالَا مَنْ أَدْرَكَهُ فَلْيَقْرَأْ عليه السلام

(আল-তাবরানী আল-আওসাত ও আল-সাগীর, হাদীকাতুস সালেহীন, হাদীস নং ৯৫৪ সূত্রে বর্ণিত)

মনোযোগ দিয়ে শোনো! আমার এবং প্রতিশ্রুত মসীহের মধ্যে আর কোনো নবী বা রাসূল থাকবে না। মনোযোগ দিয়ে শোনো-তিনি আমার পরে আমার উম্মতের মধ্যে আমার খলিফা হবেন। মনোযোগ দিয়ে শোনো- তিনি দাজ্জালকে আধ্যাত্মিকভাবে পরাস্ত করবেন; তিনি ক্রুশ ভেঙে খানখান করবেন, অর্থাৎ ক্রুশীয় মতবাদকে খণ্ডন ও ধ্বংস করবেন; তিনি জিযিয়া রহিত করবেন, অর্থাৎ ধর্মীয় যুদ্ধের অবসান ঘটবে। আর মনোযোগ দিয়ে শোনো-যে-ই তাঁকে পাবে, সে যেন আমার সালাম তাঁর কাছে পৌঁছে দেয়।

তদ্রূপ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, পরিস্থিতি যতই কঠিন হোক না কেন, তারা যেন ইমাম মাহদীর কাছে উপস্থিত

হয়ে তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করে। তিনি বলেছেন:

"যখন তোমরা তাঁকে দেখবে, তখন তাঁর হাতে বাইআত করবে–যদিও তোমাদের বরফের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয়; কারণ তিনি আল্লাহর খলিফা, মাহদী।"

(আবু দাউদ, খণ্ড ২, খুরুজুল মাহদী)

হে লোকসকল! যখন তোমরা তাঁর সম্পর্কে জানতে পারবে, তখন অবশ্যই তাঁর হাতে বাইআত করবে–যদিও বরফের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয়। অর্থাৎ পরিস্থিতি যতই কঠিন বা প্রতিকূল হোক না কেন, অবশ্যই তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ করতে হবে; কারণ তিনি হবেন মাহদী, আল্লাহর খলিফা।

মহানবী (সা.)–এর এই বাণীসমূহ থেকে ইমাম মাহদীর মকাম ও মর্যাদা সুস্পষ্ট হয়: তিনি মিথ্যার শক্তিকে বিনাশ করবেন; ???বের মতবাদ খণ্ডন করবেন; ধর্মীয় যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করবেন। তাঁর হাতে বাইআত করা অপরিহার্য হবে এবং তাঁর কাছে মহানবীর সালাম পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন হবে। মহানবী আরও বলেছেন যে, তাঁর এবং মাহদীর মধ্যে আর কোনো নবী বা রাসূল থাকবে না–কারণ তিনি হবেন আল্লাহর খলিফা।

সম্মানিত শ্রোতৃবৃন্দ! হযরত মসীহ ও মাহদী (আলাইহিস সালাম), ২৩ মার্চ ১৮৮৯ সালে প্রথম বাইআত গ্রহণ করেন। এই বাইআত ধীরে ধীরে বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করে একশত পঁচিশ বছরেরও বেশি সময়ে বিশ্বের দুই শতাধিক দেশে বিস্তৃত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে খিলাফতে আহমদিয়ার খলিফাগণ ও জামাআতের মুবাল্লিগদের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ, মহাদেশ, শহর ও গ্রামে এই বাইআত বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে স্যাটেলাইট সম্প্রচারের মাধ্যমে একই সময়ে বিশ্বব্যাপী খলিফাতুল মসীহের মুবারক হাতে এই বাইআত সম্পন্ন হয়।

এ প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী সৎ আলেমগণও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, হযরত শাহ রফীউদ্দীন সাহেব দেহেলভী তাঁর কিয়ামত নামা গ্রন্থের ৪ নং পৃষ্ঠায় লিখেছেন:

"এই ঘটনার নিদর্শন হলো–এর পূর্বে রমজান মাসে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হবে। বাইআতের সময় আকাশ থেকে এই বাক্যে আহ্বান করা হবে: 'হাযা খলিফাতুল্লাহিল মাহদী, ফাসমা'উ লাহু ওয়া আতী'উ'–এটা আল্লাহর খলিফা মাহদী; অতএব তার কথা শোনো এবং তার আনুগত্য করো। এই আওয়াজ বিশেষ ও সাধারণ সকলেই শুনবে।"

আলহামদুলিল্লাহ! এই আন্তর্জাতিক বাইআত প্রতি বছর যুক্তরাজ্যে অনুষ্ঠিত জালসা সালানার সময় অনুষ্ঠিত হয়, যার সূচনা ১৯৯৩ সালে হয়েছে এবং যা এখন ত্রিশ বছরেরও অধিককাল ধরে অব্যাহত রয়েছে। প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ আহমদিয়া মুসলিম জামাআতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন এবং প্রতি বছর এই আহ্বান উচ্চারিত হয়: "এই আল্লাহর খলিফা মাহদী–তার কথা শোনো এবং তার আনুগত্য করো।"

এই হলো মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহের মহান ও গৌরবময় মাকাম ও মর্যাদা, যা এ যুগে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আলাইহিস সালাম)–এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বলেছেন:

"আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, যারা সত্যের অনুসন্ধানকারী, তারা যেন আমার হাতে বাইআত গ্রহণ করে–সত্য ঈমান, ঈমানের পবিত্রতা ও মাওলার প্রেম অর্জনের জন্য এবং অপবিত্র শিক্ষা, অলসতা ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ জীবন পরিত্যাগ করার জন্য।"

(ইশতেহার, ১ ডিসেম্বর ১৮৮৮, মাজমু'আ ইশতিহারাত, খণ্ড ১, পৃ. ১৮৮)

সম্মানিত শ্রোতাবর্গ! আগমনকারী ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনেও মহানবী (সা.)–এর প্রসঙ্গে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, তাঁর যুগে ইসলাম বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক বিজয় লাভ করবে। সুতরাং আল্লাহ তাআলার বাণী হলো:

هُوَ الَّذِیۡۤ اَرۡسَلَ رَسُوۡلَهٗ بِالۡهُدٰی وَدِیۡنِ الۡحَقِّ لِیُظۡهِرَهٗ عَلَی الدِّیۡنِ کُلِّهٖ ۙ وَلَوۡ کَرِهَ الۡمُشۡرِکُوۡنَ

অর্থাৎ, তিনিই তাঁহার রসুলকে হেদায়াত এবং সত্য ধর্ম সহকারে পাঠাইয়াছেন যেন তিনি ইহাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন, মোশরেকগণ যত অসন্তুষ্টই হউক না কেন।

(সূরা সাফ্ফ, আয়াত: ১০)

এই আয়াতের তাফসিরে অতীতের মুসলিম মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন যে সকল ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় প্রতিশ্রুত মাহদী ও মসীহ মাওউদের যুগে প্রকাশিত হবে।

তাফসির ইবন জারিরে লেখা আছে: হাযা 'ইন্দা খুরুজিল মাহদী–অর্থাৎ উক্ত বরকতময় আয়াতে যে ইসলামের বিজয়ের কথা বলা হয়েছে, তা ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের সময় বাস্তবায়িত হবে।

তাফসির জামে' আল-বায়ান-এ উল্লেখ আছে: ওয়া যালিকা 'ইন্দা নুযূলি 'ঈসা ইবনে মারইয়াম–অর্থাৎ এই বিজয় হযরত ঈসা ইবনে মারইয়ামের অবতরণের সময়, অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহের যুগে সংঘটিত হবে।

শিয়া সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বিহারুল আনোয়ার (খণ্ড ১৩, পৃ. ১৩)–এ লেখা আছে: নাযালাত ফিল কায়িম মিন আলে মুহাম্মদ–অর্থাৎ এই আয়াত 'আল-কায়িম', অর্থাৎ ইমাম মাহদীর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আলাইহিস সালাম) বলেন:

"প্রায় কুড়ি বছর পূর্বে আমি এই কুরআনিক আয়াত সম্পর্কে একটি ইলহাম লাভ করি: হুয়াল্লাযী আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়া দ্বীনিল হক্কি লিইউযহিরাহু 'আলাদ দ্বীনি কুল্লিহি–'তিনি সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল ধর্মের উপর প্রাধান্য দান করেন।' এই ইলহামের মাধ্যমে আমাকে বুঝানো হয়েছিল যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন যাতে আমার হাত দ্বারা তিনি ইসলামকে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করেন। স্মরণ রাখা উচিত যে, এটি পবিত্র কুরআনের এক মহান ভবিষ্যদ্বাণী, যার ব্যাপারে গবেষক আলেমদের ঐকমত্য রয়েছে যে তা প্রতিশ্রুত মসীহের হাতে পূর্ণতা লাভ করবে। আমার পূর্বে অতিক্রান্ত কোনো ওলী বা আধ্যাত্মিক নেতা নিজেকে এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যায়ন–স্থল বলে দাবি করেননি এবং কেউ এ দাবিও করেননি যে এই আয়াত তাঁর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু যখন আমার সময় এলো, তখন আমি এই ইলহাম লাভ করি এবং আমাকে জানানো হয় যে আমি–ই এই আয়াতের সত্যায়ন–স্থল এবং আমার যুগেই অন্যান্য ধর্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে।"

(তিরইয়াকুল কুলূব, পৃ. ৪৭)

সম্মানিত শ্রোতৃবৃন্দ, হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম)–এর মহান মর্যাদা ও অবস্থান এই যে, তিনি খলিফাতুল্লাহ (আল্লাহর প্রতিনিধি)। এই মর্যাদায় তিনি নবী হিসেবেও আখ্যায়িত হন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

লাইসা বাইনী ওয়া বাইনা হু নাবী–"আমার এবং তার (মাহদীর) মধ্যবর্তী সময়ে আর কোনো নবী থাকবে না।"

আরও বর্ণিত হয়েছে: '***আবু বকর খাইরুন নাস বা'দী ইল্লা আন ইয়াকুনা নাবিয়্যুন–***" আমার পর মানুষের মধ্যে আবু বকর সর্বোত্তম, তবে যদি কোনো নবী আবির্ভূত হয় (তবে ভিন্ন কথা)।" (কানযুল উম্মাল, খণ্ড ৬২, পৃ. ১৩৭–১৩৮)

অতঃপর মহানবী (সা.) কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এমন এক খিলাফত ব্যবস্থার সুসংবাদ প্রদান করেন। হযরত হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন:

"তোমাদের মধ্যে নবুওয়ত কায়েম থাকবে যতদিন আল্লাহ চাইবেন। তারপর তিনি তা উঠিয়ে নেবেন। এরপর নবুওয়তের আদর্শে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, তা–ও থাকবে যতদিন আল্লাহ চাইবেন। তারপর তিনি তা উঠিয়ে নেবেন এরপর রাজতন্ত্রের যুগ আসবে, যতদিন আল্লাহ চাইবেন তা থাকবে। তারপর তিনি তা উঠিয়ে নেবেন। এরপর পুনরায় নবুওয়তের আদর্শে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে।"

এ কথা বলে তিনি নীরব হন।

আরও বলেছেন: "যদি তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফাকে দেখতে পাও, তবে তাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো, যদিও তোমাদের দেহ ছিন্নভিন্ন করা হয় এবং সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া হয়।" (মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বল, হাদিস নং ২২৯১৬)

সম্মানিত উপস্থিতিবর্গ, আজ সেই খলিফাতুল্লাহ আবির্ভূত হয়েছেন, যার মর্যাদা ও অবস্থান এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর খলিফার মাধ্যমে ইসলামের আলো বিশ্বের ২২০টি দেশে পৌঁছে গেছে এবং আল্লাহর কৃপায় দিন দিন তা বিস্তৃত হচ্ছে।

হযরত আমীরুল মুমিনীন, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলিফাতুল মসীহ পঞ্চম (আল্লাহ তাঁকে পরাক্রমশালী সাহায্য দ্বারা শক্তিশালী করুন), জামাআতের উদ্দেশ্যে বলেন:

"আপনারা যদি উন্নতি করতে চান এবং বিশ্বে প্রাধান্য অর্জন করতে চান, তবে আমার উপদেশ ও বার্তা এই যে, আপনারা খিলাফতের সাথে দৃঢ়ভাবে সম্পর্ক স্থাপন করুন এবং আল্লাহর এই রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করুন। আমাদের সকল উন্নতির মূল রহস্য খিলাফতের সাথে সম্পর্কের মধ্যেই নিহিত।"

(আল–বদর, ১৮/২৫ ডিসেম্বর ২০০৮, খিলাফত জুবিলি সংখ্যা)

তিনি আরও বলেন:

"আজ পৃথিবী ভয়াবহ অস্থিরতার শিকার। মুসলমানরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে বিদ্বেষে লিপ্ত। পবিত্র কুরআন ও হাদিসের ভাণ্ডার থাকা সত্ত্বেও তারা সেই নেতৃত্বকে চিনতে ব্যর্থ, যাকে আল্লাহ তাদের একত্রিত করার জন্য নিয়োজিত করেছেন। আপনারা সৌভাগ্যবান যে, ইমামুযযামান প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)–এর জামাআতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার এবং খিলাফত ব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের তাওফিক পেয়েছেন, যা আল্লাহর অনুগ্রহে স্থায়ী। আপনারা যত বেশি খলিফায়ে ওয়াক্তের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক দৃঢ় করবেন, তত বেশি দীনী ও দুনিয়াবী বরকত লাভ করবেন। পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নত হবে, সমাজে শান্তির পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হবে। অতএব, এই নিরাপত্তার দুর্গ থেকে কল্যাণ লাভের জন্য খিলাফতের সাথে সম্পর্ক আরও দৃঢ় করতে হবে, ইসলামের বিজয় ও বিশ্বশান্তির জন্য দোয়া করতে হবে, নিজেদের মানদণ্ড উন্নত করতে হবে এবং দায়িত্বশীলদের সাথে সহযোগিতা করে খিলাফতের হাত–পা ও খলিফায়ে ওয়াক্তের জন্য 'সুলতান নাসীর' হয়ে উঠতে হবে।"

(আল–বদর, ১৮/২৫ ডিসেম্বর ২০০৮, খিলাফত জুবিলি সংখ্যা)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য ও ধর্মের পুনর্জাগরণ

আজিজ আহমদ নাসির, মুরুব্বী সিলসিলা

هُوَ الَّذِیْ بَعَثَ فِی الْاُمِّیّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ یَتْلُوْا عَلَیْهِمْ اٰیٰتِهٖ وَیُزَكِّیْهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ۔ وَّاٰخَرِیْنَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوْا بِهِمْ ؕ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ -

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ!

ত্রয়োদশ হিজরী শতাব্দীর শেষভাগ এবং চতুর্দশ শতাব্দীর সূচনাকাল ছিল এমন এক যুগ, যা কুরআনের এই বাণীর বাস্তব প্রতিচ্ছবি উপস্থাপন করছিল: "জলে ও স্থলে বিপর্যয় প্রকাশিত হয়েছে।" মুসলিম উম্মাহ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, আর ঈমান যেন মানুষের অন্তর থেকে উঠে গিয়ে সুরাইয়া নক্ষত্রে-এ আশ্রয় নিয়েছিল।

যারা নিজেদেরকে ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত বলে পরিচয় দিত, তাদের আধ্যাত্মিকতা বিকৃত হয়ে পড়ছিল দার্শনিক, বস্তুবাদী ও তথাকথিত ধর্মীয় নেতাদের প্রভাবের কারণে; তাদের অনুমাননির্ভর মতবাদ ও ভ্রান্ত আকীদা গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছিল। দাজ্জালী ফিতনা চরম পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল, এবং তার প্রবক্তারা নিজেদের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও বিভ্রান্তিকর শিক্ষার মাধ্যমে কু-উদ্দেশ্য সাধনে সর্বশক্তি-দেহ, মন ও সম্পদ-নিয়ে সচেষ্ট ছিল।

সকল ধর্মের অনুসারীরা-বিশেষত মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত লোকেরা-প্রকৃত শিক্ষাবলী থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। তারা সরল-সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পথভ্রষ্ট ও আল্লাহর গজবপ্রাপ্তদের পথে চলছিল, অথচ নিজেদেরকে নিরাপদ ও সঠিক পথের অনুসারী বলে মনে করছিল।

এই সমস্ত কিছুই পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা এবং সৃষ্টিজগতের গৌরব, মানবজাতির শ্রেষ্ঠতম, খাতামুন নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সংঘটিত হচ্ছিল।

মুসলমানরা পবিত্র কুরআনের সাথে কেমন আচরণ করবে, সে সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَقَالَ الرَّسُوْلُ یٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِی اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا (الفرقان: آیت 31)

অর্থাৎ এবং এই রসুল বলিবে,'হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমার জাতি এই কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তু বানাইয়া লইয়াছে।' (সূরা ফুরকান: ৩১)

অনুরূপভাবে মহানবী (সা.) বলেন:

یَكُوْنُ فِیْ اُمَّتِیْ فَزْعَةٌ فَیَصِیْرُ النَّاسُ اِلٰی عُلَمَاءِهِمْ فَاِذَا هُمْ قِرَدَةٌ وَخَنَا زِیْرُ

অর্থাৎ: হে মুসলমানগণ! আমার উম্মতের উপর এমন এক সময় আসবে যখন মানুষের মধ্যে চরম অস্থিরতা ও উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়বে। সে অবস্থায় তারা নিজেদের আলেমদের দিকে ছুটে যাবে, যেন তারা তাদের দুঃখ-কষ্ট ও অশান্তি দূর করেন। কিন্তু তারা তাদেরকে বানর ও শূকরের ন্যায় পাবে-যারা একে অপরের অন্ধ অনুকরণ করছে এবং অপবিত্রতার মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছে।

অতএব, যখন চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর সূচনা হলো, তখন মুসলমানদের অবস্থা এমন শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে তা ভাষায় প্রকাশ করা দুষ্কর। এই চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে আলতাফ হোসেন হালি লিখেছেন:

রইল না দীন, রইল না ইসলাম,
কেবল ইসলামের নামটুকুই রইল অবশিষ্ট।

অনুরূপভাবে মহম্মদ ইকবাল আক্ষেপ করে বলেন:

শোর উঠেছে-দুনিয়া থেকে মুসলমান লুপ্ত হয়ে গেছে;
আমরা বলি-কখনও কি সত্যিই মুসলমান ছিল?

আচার-ব্যবহারে তোমরা খ্রিস্টান, সভ্যতায় হিন্দু-
এরা সেই "মুসলমান, যাদের দেখে ইহুদিরাও লজ্জিত হবে।

তুমি হয়তো সাইয়্যিদ, মির্জা বা আফগান-
তুমি সবই হয়েছ, কিন্তু বলো তো, তুমি কি মুসলমানও?

এমন এক সময়ে পৃথিবী এক নতুন আধ্যাত্মিক বিপ্লবের তীব্র প্রয়োজন অনুভব করছিল। সুতরাং আত্মার পরিশুদ্ধি সাধন (তাযকিয়াতুন নুফূস), কিতাব ও হিকমতের প্রকৃত শিক্ষার সাথে মানবজাতিকে পরিচিত করা এবং তাদেরকে জীবন্ত খোদার সাথে পুনরায় সংযুক্ত করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক মহান সংস্কারকের আগমনের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন।

সম্মানিত শ্রোতৃবৃন্দ! যখন "ওয়া আখারীনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম" ("এবং তাদের মধ্য থেকে অন্যদের জন্যও, যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি)-এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, তখন সাহাবায়ে কেরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করেন: "হে আল্লাহর রাসূল! এ 'অন্যরা' কারা, যাদের মধ্যে আপনার দ্বিতীয় আবির্ভাব ঘটবে?

তখন তিনি সেই মজলিসেই উপস্থিত সালমান ফারসি (রা.)-এর কাঁধে হাত রেখে বলেন:

لَوْ كَانَ الْاِیْمَانُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَیَّا لَنَالَهٗ رَجُلٌ اَوْ رِجَالٌ مِنْ هٰؤُلَاءِ

লাও কানা আল-ঈমানু মু'আল্লাকান বি-স্সুরাইয়া লানালাহু রাজুলুন আও রিজালুন মিন হাউলা'

(সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, সূরা আল-জুমু'আহ)

অর্থাৎ, "হে আমার সাহাবীগণ! যদি ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রেও ঝুলে থাকে, তবুও এদের মধ্য থেকে একজন বা একাধিক ফারসি বংশোদ্ভূত ব্যক্তি তা পুনরায় এনে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবে।"

এই সেই মহান সংস্কারক, যাকে মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ নামে অভিহিত করেছেন-যিনি অভ্যন্তরীণভাবে উম্মতে মুহাম্মদিয়ার সংস্কার সাধন করবেন এবং বাহ্যিকভাবে অন্যান্য সকল ধর্মের উপর ইসলামের সত্যতা প্রমাণ করে এই দ্বীনকে সকল ভ্রান্ত মতবাদের উপর বিজয়ী করবেন।

এ প্রসঙ্গে পরিপূর্ণ পথপ্রদর্শক ও মহান নেতা হযরত মহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন:

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا الْمَهْدِیُّ اِلَّا عِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: ঈসা ইবনে মরিয়ম ব্যতীত কোন মাহদী নেই। (ইবনে মাজা, বাব শিদ্দাতুয যামান, পৃ: ২৫৭)

یُوْشِكُ مَنْ عَاشَ مِنْكُمْ اَنْ یَّلْقٰی عِیْسَی ابْنَ مَرْیَمَ اِمَامًا مَهْدِیًّا حَكَمًا عَدْلًا یَكْسِرُ الصَّلِیْبَ وَیَقْتُلُ الْخِنْزِیْرَ

(মুসনাদ আহমদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৫৬)

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হবে, সে ঈসা ইবনে মারইয়ামের যুগ লাভ করবে। তিনিই ইমাম মাহদী, ন্যায়পরায়ণ বিচারক ও হাকাম হবেন। তিনি ক্রুশ ভঙ্গ করবেন এবং শূকর হত্যা করবেন।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! সে যুগ ছিল বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন-উভয় দিক থেকেই-এমন ভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার যুগ, যখন প্রতিটি ধর্মের অনুসারী এক আসমানি সংস্কারকের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। সৎপ্রকৃতির মানুষ কাঁদত, রাত জেগে ইবাদতে লিপ্ত থাকত, আকাশের দিকে হাত তুলে নিজেদের দুঃখ, অসহায়ত্ব ও বিপর্যয়ের কথা ব্যক্ত করে করুণাময় প্রভুর কাছে মিনতি করত: "হে আল্লাহ! সেই সংস্কারককে প্রেরণ করুন; গোমরাহির স্রোত আমাদের মাথার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে।"

মাওলভী শাকিল আহমদ সহওয়ানী তাঁর বেদনাকে কবিতায় প্রকাশ করেন:

আহমদের দীন যুগ থেকে মুছে যাচ্ছে নাম,
হে আমার আল্লাহ! এ কেমন দুর্যোগ?

কেন সত্য মাহদী আবির্ভূত হন না?
হে প্রভু! ঈসার অবতরণে এত বিলম্ব কেন?

(আল-হক্কুস্ সরীহ ফী হায়াতিল মাসীহ, পৃ. ১৩৩)

অনুরূপভাবে, চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে গভীর বেদনাভরে মাওলভী আবুল খায়ের নবাব নূরুল হাসান খান লিখেন:

"ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু সে শতাব্দী সম্পূর্ণ অতিবাহিত হয়েছে, মাহদী আসেননি। এখন চতুর্দশ শতাব্দী আমাদের উপর উপস্থিত। এই গ্রন্থ লেখার সময় পর্যন্ত এ শতাব্দীর ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। হয়তো আল্লাহ তাআলা তাঁর অনুগ্রহ, ন্যায়, দয়া ও করুণার প্রকাশ করবেন এবং চার বা ছয় বছরের মধ্যে মাহদী আবির্ভূত হবেন।"

(ইক্তিরাবুস্ সা'আহ, পৃ. ২২১, ১২০১ হিজরি)

একইভাবে শিয়া আলেম আসর ফিদা বুখারী দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে কবিতায় বলেন:

অপেক্ষা করতে করতে আমরা ক্লান্ত,
দেওয়ালের ছায়াও ঢলে পড়ছে-এসো!

হে আমাদের প্রতীক্ষিত ইমাম, এখন এসো,
বহুদিন ধরে শোকাহতরা অপেক্ষায়-এসো!

(মা'আরিফে ইসলাম, সাহিবুয্ জামান সংখ্যা, পৃ. ২৬)

সংক্ষেপে বলতে গেলে, এহেন পরিস্থিতিতে সৌভাগ্যবান আত্মাদের হৃদয় থেকে নিঃসৃত দীর্ঘশ্বাস, ক্রন্দন ও আর্তনাদ আকাশের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। তাদের দৃষ্টি, প্রার্থনা ও আহ্বান নিবদ্ধ ছিল সেই মহান আসমানি সংস্কারকের দিকে, যার আগমনের প্রতিশ্রুতি উম্মতকে পূর্বেই প্রদান করা হয়েছিল।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! এটি এমন এক যুগ ছিল, যখন খ্রিস্টধর্ম ও অন্যান্য ধর্ম ইসলামের মতো শান্তিপূর্ণ ও পরিপূর্ণ ধর্মের বিরুদ্ধে আপত্তির

ঝড় তুলেছিল–মনে হচ্ছিল যেন সকলে মিলে ইসলামের কণ্ঠরোধে উদ্যত। অথচ এমন কেউ ছিল না, যে তাদের যুক্তিপূর্ণ জবাব দিতে পারে। বরং অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে মুসলমানরাই জীবন্ত ধর্ম ইসলাম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করেছিল।

এমন অশান্ত সময়ে পাঞ্জাবের অখ্যাত গ্রাম কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আলাইহিস সালাম)। সেখান থেকেই তিনি ইসলামের প্রতিরক্ষার কাজ শুরু করেন। ইংরেজরা ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য লুধিয়ানাকে কেন্দ্র হিসেবে বেছে নিয়েছিল এবং ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে রেভারেন্ড জে. সি. লৌরি সেখানে আগমন করেন। এখনও এক বছর পূর্ণ হয়নি, এমন সময় সেই মিশনের মূলোৎপাটনের জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর সম্পর্কে পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন:

ফাইয়াতলুবুহু হাত্তা ইউদরিকাহু বি–বাবি লুদ্দি ফাইয়াক্তুলুহু–

"তিনি (প্রতিশ্রুত মসীহ) দাজ্জালকে অনুসরণ করতে থাকবেন, অবশেষে লুদ্দের ফটকে তাকে পাকড়াও করে পরাস্ত করবেন।"

এই ভবিষ্যদ্বাণী স্বমহিমায় পূর্ণতা লাভ করে, যখন প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) লুধিয়ানায় বায়আত গ্রহণ করেন।

সম্মানিত শ্রোতৃবৃন্দ! তিনি তাঁর সমগ্র জীবন ইসলামের প্রতিরক্ষায় ব্যয় করেন এবং সকল ধর্মের আলেমদের চ্যালেঞ্জ জানান–তারা যেন এসে ইসলামের উপর নিজেদের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। কিন্তু কেউই তাঁর মোকাবিলায় এগিয়ে আসেনি।

পরীক্ষা ও মোকাবিলার জন্য ডাকা হলো বহুজনকে–

কিন্তু কেউই উপস্থিত হলো না।

আমরা প্রত্যেক বিরোধীকে মোকাবিলার ময়দানে আহবান করেছি।

খ্রিস্টধর্ম, আর্য সমাজ ও ব্রাহ্ম সমাজের খণ্ডনে তাঁর ইসলামী খিদমত এত উচ্চ, মহান ও গৌরবময় ছিল যে, ডক্টর ওংৎধৎ অযসবফ নায়েক সাহেবের ভাষায়, "তিনি সেই সময়কার আলেমদের নয়নের মণি হয়ে উঠেছিলেন।"

সংক্ষেপে, সেই অস্থিরতার যুগে আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি এবং মহানবী (সা.)–এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই, যুগের প্রয়োজন পূরণ করতে কাদিয়ানের হযরত মির্যা গোলাম আহমদ প্রতিশ্রুত মসীহ ও প্রতিশ্রুত মাহদী হিসেবে আবির্ভূত হন এবং তিনি ঘোষণা করেন–

এ ছিল সেই সময়–মসীহার সময়, অন্য কারও সময় নয়;

আমি না এলে অবশ্যই অন্য কেউ আসত।

আমি ইবনে মারইয়াম, কিন্তু আকাশ থেকে অবতীর্ণ হইনি;

এবং আমি মাহদী, তবে তলোয়ার ও যুদ্ধ ছাড়াই।

তিনি আরও বলেন:

وَاللّٰہِ اِنِّیْ اَنَاالْمَسِیْحُ الْمَوْعُوْدُ وَمَعِیَ رَبِّیَ الْوَدُوْدُ۔وَ وَاللّٰہِ اِنَّہٗ لَا یُضَیِّعُنِیْ وَ لَوْ عَادَانِیَ الْجِبَالُ۔وَ وَاللّٰہِ اِنَّہٗ لَا یَتْرُکُنِیْ وَ لَوْ تَرَکَنِیَ الْاَحْبَاءُ وَ الْعِیَالُ۔وَ وَاللّٰہِ اِنَّہٗ یَعْصِمُنِیْ وَلَوْ اَتَی الْعِدَا بِالْمِرْھَفَاتِ"

(মাওয়াহিবুর রাহমান, রূহানী খাযায়িন, খণ্ড ১৯, পৃষ্ঠা ২৭১)

"অর্থাৎ আল্লাহর কসম! আমিই সেই প্রতিশ্রুত মসীহ। আর আমার সাথে আছেন স্নেহময় প্রভু। আল্লাহর কসম! তিনি আমাকে কখনো বিনষ্ট হতে দেবেন না, যদিও পাহাড়সম ব্যক্তিত্ব আমার বিরোধিতা করে। আল্লাহর কসম! তিনি আমাকে পরিত্যাগ করবেন না, যদিও বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন আমাকে ছেড়ে যায়। আল্লাহর কসম! তিনি আমাকে রক্ষা করবেন, যদিও শত্রুরা তরবারি দিয়ে আমার ওপর আঘাত হানে।"

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! কত দুঃখের বিষয় যে সেই আলেমরাই, যারা দিনরাত ইমাম মাহদী ও যুগের মসীহের আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন–এ বিশ্বাসে যে তাঁর আবির্ভাব উম্মতের পতনকে উন্নতিতে রূপান্তরিত করবে–তারাই নিজেদের জীর্ণ–পুরাতন আকীদার ভিত্তিতে বিরোধীদের প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারা এমন এক বিরোধিতা ও অসভ্যতার ঝড় তুলেছিলেন যে, যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন সত্য সংস্কারক উপস্থিত না থাকতেন, তবে তিনি সেই ঝড়ের স্রোতে এমনভাবে ভেসে যেতেন যে তাঁর অস্তিত্বেরও কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট থাকত না। কিন্তু এখানে ছিলেন আল্লাহর বীর, আল্লাহর সত্য মসীহ, মহানবী (সা.)–এর সত্য প্রেমিক ও দাস–যাঁর কারণে সেই ঝড় নিজেই নাম–নিশানাহীন হয়ে বিলীন হয়ে গেল। কেউ কত সুন্দর বলেছেন–

স্মরণ করো সে দিন, যখন দ্বীনের সকল স্তম্ভ বলত–

"প্রতিশ্রুত মাহদী অচিরেই সত্যরূপে প্রকাশিত হবেন।"

কে ছিল যে উদ্দীপনা ভরে তাঁর আগমনের আকাঙ্ক্ষা করেনি?

কে ছিল যে আগত সেই ব্যক্তিকে ভালোবাসত না?

ইসলামের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী(আ.)–প্রতিশ্রুত মসীহ–বলেন, তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ছিল يُحْيِ الدِّيْنَ وَيُقِيْمُ الشَّرِيْعَةَ – অর্থাৎ ইসলাম ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং শরীয়তে মুহাম্মদী –কে বিশ্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। তাজদীদ বা দ্বীনের নবায়ন বলতে বোঝায় দ্বীনকে তার মূল আত্মাসহ পুনর্জীবিত করা। তিনি কোনো নতুন শরীয়ত প্রবর্তন করেননি এবং ইসলামে কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনেননি; বরং কুরআন ও সুন্নাহর মূল শিক্ষাকে সতেজ ও জীবন্ত করে তুলেছেন। তিনি তাওহীদের ভিত্তিকে দৃঢ় করেছেন, মহানবী (সা.)–এর ভালোবাসা অন্তরে জাগ্রত করেছেন এবং বাস্তব তাকওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন। প্রকৃত তাজদীদ হলো দ্বীনকে বিদআত ও ভ্রান্ত ধারণা থেকে পবিত্র করে তার আসল শিক্ষা প্রচার করা।

তিনি বিশ্ববাসীর সামনে স্পষ্ট করে দেন যে ইসলামই একমাত্র সত্য, পরিপূর্ণ ও জীবন্ত ধর্ম। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বারাহীনে আহমদীয়ায়–এ তিনি শক্তিশালী যুক্তি ও আধ্যাত্মিক প্রমাণের মাধ্যমে পবিত্র কুরআনের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে কুরআন একটি জীবন্ত কিতাব, যা আজও আল্লাহর পক্ষ থেকে নিদর্শন প্রকাশ করে। এভাবে তিনি ইসলামকে একটি ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করেন–যা শুধু তাত্ত্বিক শিক্ষা নয়, বরং আল্লাহর সাথে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপনের আহ্বান জানায়।

সময়ের পরিক্রমায় মুসলমানদের মধ্যে বহু বিদআত, কুসংস্কার ও দুর্বলতা প্রবেশ করেছিল এবং কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা আড়ালে চলে গিয়েছিল। তিনি তাঁর রচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে ইসলামের সরল, পবিত্র ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং প্রমাণ করেন যে ইসলাম এমন এক জীবন্ত ধর্ম, যা প্রত্যেক যুগের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। তিনি মুসলমানদের কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসার আহ্বান জানান এবং জানান যে প্রকৃত মুক্তি সেখানেই নিহিত।

জীবন্ত আল্লাহ

তাঁর আগমনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল তাওহীদের প্রতিষ্ঠা। সে সময় বিশ্ব বস্তুবাদ, নাস্তিক্যবাদ ও বিভিন্ন প্রকার শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত হচ্ছিল। অনেকেই আল্লাহর অস্তিত্বই অস্বীকার করছিল, আবার কেউ কেউ তাঁর সাথে শরীক স্থাপন করছিল। তিনি শক্তিশালী যুক্তি ও আধ্যাত্মিক নিদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও একত্ব প্রমাণ করেন এবং মানুষকে সত্য আল্লাহর দিকে আহ্বান জানান। তিনি শিক্ষা দেন যে মানুষের প্রকৃত সুখ ও সফলতা আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যেই নিহিত। তিনি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এক জীবন্ত আল্লাহর ধারণা বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করেন।

তিনি বলেন–

"আল্লাহ তাআলা এই যুগকে অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখে এবং বিশ্বকে উদাসীনতা, কুফর ও শিরকে নিমজ্জিত দেখে, ঈমান, সত্যবাদিতা, তাকওয়া ও ন্যায়পরায়ণতা লুপ্ত হতে দেখে আমাকে প্রেরণ করেছেন, যাতে আমি জ্ঞানগত, ব্যবহারিক, নৈতিক ও ঈমানি সত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করি এবং ইসলামকে তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করি, যারা দর্শন, প্রকৃতিবাদ, অবাধ্যতা, শিরক ও নাস্তিকতার পোশাকে এই ঐশী বাগানকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চায়।"

(আয়িনাহ কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়িন, খণ্ড ৫, পৃ. ২৫)

জীবন্ত রাসূল (সা.)–এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন

আহমদিয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মহানবী মহম্মদ (সা.)–এর প্রকৃত ও মহান মর্যাদা স্পষ্ট করেন এবং খতমে নবুয়তের আকীদার ওপর পূর্ণ ঈমান ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.) হলেন খাতামুন নবিয়্যীন এবং তাঁর পরে কোনো নতুন শরীয়তপ্রণেতা নবী আসতে পারেন না। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে যে কোনো আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ মহানবী (সা.)–এর পূর্ণ অনুসরণের ফলেই অর্জিত হয়। এভাবে তিনি খতমে নবুয়তের আকীদাকে গভীর ও অর্থবহ আধ্যাত্মিক রূপে উপস্থাপন করেন এবং দেখান যে নবী করীম (সা.)–এর পরিপূর্ণ আনুগত্যই সকল আধ্যাত্মিক উন্নতির উৎস।

তিনি বলেন–

কল্পনা ও ধারণার উর্ধ্বে আহমদের মহিমা;

দেখো তাঁর দাস–যিনি যুগের মসীহ।

এভাবে তিনি মহানবী (সা.)–এর মর্যাদা উজ্জ্বল করে তুলে ধরেন এবং এক জীবন্ত আল্লাহর সাথে এক জীবন্ত রসূলের বাস্তবতা বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করেন।

জীবন্ত কিতাবের সাথে পরিচয়

তিনি বলেন–

"তোমাদের জন্য একটি অপরিহার্য শিক্ষা হলো–পবিত্র কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তুর মতো ছেড়ে দিও না; কারণ তাতেই তোমাদের জীবন নিহিত। যারা কুরআনকে সম্মান করবে, তারা আসমানে সম্মানিত হবে। যারা প্রতিটি হাদীস ও প্রতিটি

বক্তব্যের ওপর কুরআনকে অগ্রাধিকার দেবে, তাদের আসমানে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। মানবজাতির জন্য আজ পৃথিবীর বুকে কুরআন ছাড়া আর কোনো কিতাব নেই এবং আদম সন্তানদের জন্য মুহাম্মদ (সা.) ছাড়া আর কোনো রসূল ও শাফায়াতকারী নেই।"

(কিশতীহে নূহ, রূহানী খাযায়িন, খণ্ড ১৯, পৃ. ১৩)

ফুরকানের নূর সব নূরের চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উদ্ভাসিত;

পবিত্র তিনি, যাঁর থেকে এ নূরের স্রোতধারা প্রবাহিত হয়েছে।

হযরত ঈসা (আ.)-এর জীবিত থাকার ভ্রান্তবিশ্বাসের খণ্ডন

হাদীসে বর্ণিত আছে-"ইয়াকসিরুস সালীব-অর্থাৎ আগত মসীহ ক্রুশ ভেঙে দেবেন। ত্রয়োদশ হিজরী শতাব্দীর শেষভাগে ইসলাম, যা সবসময় সহনশীলতা ও শান্তির শিক্ষা দিয়েছে, নিজেই বিভিন্ন ধর্মের কদর্য আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল। চারদিক থেকে শত্রুরা আক্রমণ করছিল। ভারতে তখন ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত, এবং খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছিল। এমনকি একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল-

"ভারতের সাধারণ জনসংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার চার-পাঁচ গুণ দ্রুত গতিতে এই দেশে খ্রিষ্টধর্ম বিস্তার লাভ করছে। বর্তমানে ভারতীয় খ্রিষ্টানদের সংখ্যা দশ লক্ষে পৌঁছেছে।"

(The Missionary, রচনা: Robert Clark)

যুগ বারবার আহ্বান জানাচ্ছিল যে ক্রুশের মতবাদ তখন চরম শিখরে পৌঁছে গেছে; অতএব কেউ এসে তা ভঙ্গ করুক।

সেই অনুযায়ী ১৮৯০ সালে আমাদের প্রভু, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর উপর এই ওহি নাযিল হয়: "মরিয়মের পুত্র ঈসা, আল্লাহর রাসূল, ইন্তেকাল করেছেন, এবং তাঁর সদৃশ একজন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আগমন করেছেন।" তখন তিনি ঘোষণা করেন-

হে মানুষ! তোমরা কি সত্যের প্রতি চিন্তা করবে না?

আমার অন্তরে শত শত আবেগ উথলে ওঠে।

মরিয়মের পুত্র ইন্তেকাল করেছেন-আল্লাহর কসম, এ সত্য;

সেই সম্মানিতজন জান্নাতে প্রবেশ করেছেন।

প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) নিজেই বর্ণনা করেন যে, যখন তাঁর বয়স পনেরো বছর, তখন থেকেই খ্রিষ্টানদের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক শুরু হয়। খ্রিষ্টধর্মের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর এমন উদ্দীপনা ছিল যে তিনি বলেন-

"তাদের ধর্ম একটি মাত্র স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে-মরিয়মের পুত্র ঈসা এখনও আকাশে জীবিত আছেন। এই স্তম্ভটিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দাও, তারপর দেখো খ্রিষ্টধর্ম পৃথিবীতে কোথায় দাঁড়ায়। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা চান এই স্তম্ভ ভেঙে দিতে এবং ইউরোপ ও এশিয়ায় তাওহীদের সুশীতল বাতাস প্রবাহিত করতে। এই উদ্দেশ্যেই তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন।"

(ইজালায়ে আওহাম, পৃ. ২৩২)

ধর্মীয় যুদ্ধের অবসান

বুখারীর এক হাদিসে প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) শেষ যুগে আগত নবী সম্পর্কে বলেন: ***'ইউজাউল হারব'***-অর্থাৎ মসীহ আগমন করলে তিনি যুদ্ধের অবসান ঘটাবেন। এর পূর্ণ বাস্তবায়নস্বরূপ প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) ঘোষণা করেন-

আব ছোড় দো জিহাদ কা এ্যয়ে দোস্তো খায়াল

দ্বাঁ কে লিয়ে আব হারাম হ্যা জঙ্গ ও জিদাল

অর্থাৎ-হে বন্ধুগণ! এখন তরবারির জিহাদের চিন্তা পরিত্যাগ করো;

ধর্মের নামে যুদ্ধ ও সংঘর্ষ এখন নিষিদ্ধ।

তিনি সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে শান্তির বার্তা দিয়ে আরও বলেন-

"আমি আদেশ দিচ্ছি যে, যারা আমার দলে প্রবেশ করবে তারা যেন এমন চিন্তা পরিত্যাগ করে, নিজেদের অন্তর পবিত্র করে, মানবিক সহানুভূতি গড়ে তোলে এবং পশুত্বের পক্ষে না দাঁড়ায়। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করো, কারণ এর মাধ্যমেই তাদের ঈমান বিস্তার লাভ করবে।"

(মজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, খণ্ড ৩, পৃ. ২৩)

তিনি আরও বলেন-

"আমাদের নবী (সা.) কখনও কারও বিরুদ্ধে তরবারি তোলেননি, যতক্ষণ না তারা আগে তরবারি তুলেছিল এবং নির্মমভাবে নিরপরাধ পুরুষ, নারী ও শিশুদের হত্যা করেছিল।তর্কের খাতিরে যদি মেনেও নেওয়া হয় যে এমন জিহাদ ইসলামে ছিল, যেমনটি এই মোল্লারা কল্পনা করে, তবুও এই যুগে সেই নির্দেশ আর কার্যকর নয়। কারণ লিখিত আছে যে, যখন প্রতিশ্রুত মসীহ আগমন করবেন, তখন তরবারির জিহাদ-ধর্মীয় যুদ্ধ-সমাপ্ত হবে। মসীহ না তরবারি তুলবেন, না কোনো পার্থিব অস্ত্র গ্রহণ করবেন। তাঁর দোয়া হবে তাঁর অস্ত্র এবং তাঁর দৃঢ় সংকল্প হবে তাঁর তরবারি। তিনি শান্তির ভিত্তি স্থাপন করবেন এবং এমন সময় আনবেন যখন মেষশাবক ও সিংহ একই ঘাটে পানি পান করবে। তাঁর যুগ হবে শান্তি, কোমলতা ও মানবিক সহমর্মিতার যুগ। হায়! কেন মানুষ চিন্তা করে না যে, তেরশো বছর পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে প্রতিশ্রুত মসীহ সম্পর্কে 'ইউজাউল হারব' বাক্যটি উচ্চারিত হয়েছিল?

(গভর্ণমেন্ট আংরেজি অউর জিহাদ, খণ্ড ১৭, পৃ. ৯-১০)

কলমের জিহাদ

আহমদিয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দিনরাত কলম ও জিহ্বার মাধ্যমে ইসলামের প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। সে সময় খ্রিষ্টান মিশনারি, আর্য সমাজ ও নাস্তিক দর্শনের পক্ষ থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি উত্থাপিত হচ্ছিল। তিনি শতাধিক গ্রন্থ, পুস্তিকা ও ইশতেহার রচনা করে শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামকে রক্ষা করেন এবং প্রমাণ করেন যে ইসলাম তরবারির মাধ্যমে নয়, বরং যুক্তি ও নৈতিক উৎকর্ষের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে।

এই কলমের জিহাদ সম্পর্কে তিনি বলেন-

"এটিও এক প্রকার জিহাদ। আমি রাত দুই-তিনটা পর্যন্ত জেগে থাকি; অতএব প্রত্যেকের উচিত এতে অংশগ্রহণ করা এবং দিনরাত ধর্মীয় কাজ ও প্রয়োজন পূরণে আত্মনিয়োগ করা।" (মালফুযাত, খণ্ড ৪, পৃ. ১৯৪)

আমরা যুক্তির মাধ্যমে শত্রুর সারি পদদলিত করেছি;

আমরা কলমের দ্বারা তরবারির কাজ সম্পন্ন করেছি।

সংক্ষেপে, হযরত মির্জা গুলাম আহমদ (আ.)-এর যুগ ছিল কলমের যুগ-জ্ঞান ও যুক্তির যুগ। তাঁর রচনাবলি ও প্রমাণাদির মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে ইসলামকে রক্ষা করেন। তিনি আশির অধিক গ্রন্থ রচনা করেন, তদুপরি অসংখ্য চিঠি ও ইশতেহার রেখে গেছেন, যা ইসলামের পক্ষে এক বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার।

তিনি ঘোষণা করেন-

"আল্লাহ তাআলা আমাকে এই চতুর্দশ শতাব্দীর সূচনায় নিয়োগ করেছেন ইসলামের সুদৃঢ় ধর্মকে নবায়ন ও সমর্থন করার জন্য, যাতে এই অশান্ত যুগে আমি কুরআনের মহিমা ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে পারি এবং ইসলামের ওপর আক্রমণকারী সকল শত্রুর জবাব দিতে পারি ঐসব নূর, বরকত, মুজিযা ও জ্ঞানের মাধ্যমে যা আমাকে দান করা হয়েছে।"

(বারকাতুদ দোয়া রূহানী খাযায়েন, খণ্ড ৬, পৃ. ৩৫)

তিনি আরও বলেন-

"হে সত্যসন্ধানীগণ! চিন্তা কর-এ কি সেই সময় নয়, যখন ইসলাম আসমানী সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করছিল? তোমরা কি এখনো ইসলামের চারপাশে ঘিরে থাকা বিপদসমূহ উপলব্ধি করনি? দৃষ্টি উঁচু করে দেখো, কতদূর পর্যন্ত ইসলাম অবরুদ্ধ এবং চারদিক থেকে তার দিকে তীর নিক্ষেপ করা হচ্ছে। শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে কি আল্লাহ তাআলার কারও প্রেরণ করা প্রয়োজন ছিল না, যিনি এসব বাহ্যিক আক্রমণের মোকাবিলা করবেন? (আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, পৃ: ২৫১)

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) প্রদত্ত শিক্ষার উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

****

১৩১ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২৬ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৫, ২৬ ও ২৭ শে ডিসেম্বর ২০২৪ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

সীরাত খাতামান্নবীঈন

হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম. এ (রা.)

আরবদের বাণিজ্য

আরবদের জাতীয় পেশা মূলত তিনটি ছিল। প্রথমত কৃষিকাজ, যা দেশের খুবই সামান্য অংশে সীমাবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয়ত পশুপালন- এটিও কেবল দেশের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলে সম্ভব ছিল। তৃতীয়ত বাণিজ্য, যা যথার্থই আরব দেশের প্রধান পেশা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। আরবরা প্রাচীনকাল থেকেই বাণিজ্যনির্ভর জাতি ছিল, বিশেষত যেসব গোত্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে অথবা সভ্য দেশগুলোর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বসবাস করত, তারা আদিকাল থেকেই বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল

প্রাচীন যুগে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে পণ্য পরিবহনের প্রধান মধ্যস্থতাকারী ছিল আরবরাই। তাদের বাণিজ্য কাফেলা একদিকে সিরিয়া ও মিসর এবং অন্যদিকে ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলের মধ্যে নিয়মিত যাতায়াত করত, ফলে ভারত ও সিরিয়া-মিসরের মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক সেতুবন্ধন গড়ে উঠেছিল। কিন্তু সমুদ্রপথ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার পর এই স্থলবাণিজ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সিরিয়া থেকে হিজাজ, সেখান থেকে ইয়েমেন, তারপর হাযরামাউত হয়ে আরবের পূর্ব উপকূল পর্যন্ত যে প্রাচীন স্থলপথ ছিল, তা ধীরে ধীরে অচল হয়ে পড়ে এবং প্রায় সম্পূর্ণরূপে কাফেলার যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। অবশিষ্ট থাকে কেবল দেশের অভ্যন্তরীণ সীমিত বাণিজ্য।

এই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হিজাজ, ইয়েমেন, বাহরাইন ও নাজদ প্রভৃতি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্মের প্রায় একশ বছর আগে সিরিয়া ও হিজাজ-ইয়েমেনের মধ্যে বাণিজ্য পুনরায় শুরু হয়। যদিও তা পূর্বের পরিসরে ফিরে যায়নি, তবুও দেশ কিছুটা প্রাণ ফিরে পায়। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে মক্কার কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা নিয়মিতভাবে সিরিয়া ও ইয়েমেনে যাতায়াত করত এবং কখনও কখনও আরবের অন্যান্য অঞ্চলেও যেত; তবে তাদের প্রধান বাণিজ্য ছিল সিরিয়র সঙ্গে।

মক্কা থেকে সিরিয়ার দিকে যাত্রার সবচেয়ে ব্যবহৃত পথ ছিল লোহিত সাগরের তীর ঘেঁষে উত্তরের দিকে অগ্রসর হওয়া। ইয়াসরিব নগরী-যা পরবর্তীকালে মদিনা নামে পরিচিত হয়-এই পথের নিকটেই অবস্থিত ছিল। সিরিয়ার পথে যে স্থান থেকে মদিনার পথ পূর্বদিকে বিচ্ছিন্ন হয়, সেটি হলো বদর; এখানেই মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

রপ্তানিপণ্যের মধ্যে সাধারণত মূল্যবান ধাতু, মুক্তা, পশুর চামড়া, মসলা এবং সুগন্ধি দ্রব্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর আমদানিপণ্যের মধ্যে প্রধানত শস্য, বস্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র, মদ এবং শুকনো খাদ্যসামগ্রী অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে ধারণা করা হয়।

আরবে বছরের বিভিন্ন সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য মেলার প্রচলন ছিল। দূর-দূরান্তের বণিকরা এসব মেলায় অংশগ্রহণ করত। প্রসিদ্ধ বাজারগুলোর মধ্যে ছিল সিরিয়ার নিকটবর্তী দুমাতুল জান্দাল, বাহরাইনের মিশকার, ওমানের সোহর (বা ওবা), ইয়েমেনের সানা এবং হিজাজের উকাজ।

শিক্ষা ও প্রাচীন আরবি কবিতা

আরবে শিক্ষা ছিল, তবে অত্যন্ত সীমিত। অল্প কয়েকজন ব্যক্তি ছাড়া সমগ্র দেশ প্রায় নিরক্ষর ছিল, এবং যারা শিক্ষিত ছিলেন তারা অধিকাংশই শহরাঞ্চলে বসবাস করতেন। তবুও এই সর্বব্যাপী অশিক্ষার মধ্যেও আরবরা নিজেদের ভাষার বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জলতা নিয়ে অত্যন্ত গর্বিত ছিল। তারা নিজেদের ছাড়া অন্য সব জাতিকে 'আজমী'-অর্থাৎ বোবা বা অশুদ্ধভাষী-বলে অভিহিত করত। বাস্তবিকই ভাষার শুদ্ধতা ও বাগ্মিতায় আরবদের অসাধারণ দক্ষতা ছিল।

জাহেলিয়াত যুগের কবিতা আজও সংরক্ষিত রয়েছে। সেই কবিতায় যে বাগ্মিতা, যে শক্তি ও আবেগ, যে স্বাধীন জীবনের প্রতিচ্ছবি এবং যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রবাহ দেখা যায়, তা অন্য জাতি বা যুগের কবিতায় বিরল। এসব কবির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল-তারা অন্তরের ভাব অত্যন্ত অকপটে, সরাসরি এবং নিরাভরণ ভাষায় প্রকাশ করত; সেখানে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। ফলে তাদের কবিতায় তাদের চিন্তা, অনুভূতি ও সামাজিক রীতিনীতির যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে।

আরবরাও এই গুণ সম্পর্কে সচেতন ছিল। এক ঐতিহাসিক লিখেছেন যে জাহেলিয়াত যুগে আরবরা একে অপরকে মাত্র তিনটি উপলক্ষে অভিনন্দন জানাত-একটি পুত্রসন্তানের জন্মে, কোনো কবির আবির্ভাবে এবং উৎকৃষ্ট ঘোড়াশাবকের জন্মে। এই সংক্ষিপ্ত উক্তির মধ্যেই আরব জীবনের পূর্ণ চিত্র ফুটে ওঠে।

আরবে কবিদের জাতীয় নেতা হিসেবে গণ্য করা হতো। তাদের কবিতার শক্তি দিয়ে তারা দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিতে পারত এবং সমগ্র দেশে অগ্নিসংযোগ ঘটাতে সক্ষম ছিল। বিশেষ বিশেষ স্থানে কবিরা সমবেত হয়ে সাহিত্যিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করত। নাখলা ও তায়েফের মধ্যবর্তী, মক্কার পূর্বদিকে অবস্থিত উর্বর স্থান উকাজ জাহেলিয়াত যুগে এ ধরনের সমাবেশের জন্য বিশেষ খ্যাত ছিল। প্রতি বছর জিলকদ মাসে সেখানে এক বৃহৎ মেলা বসত, যেখানে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ সমবেত হতো এবং অন্যান্য কার্যকলাপের পাশাপাশি বিভিন্ন আরব গোত্রের মধ্যে কবিতা ও বাগ্মিতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো।

মক্কা বিজয়ের পর যখন আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিদল মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত হয়, তখন বনু তামিম গোত্র একটি তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ উপস্থাপন করে, যা আরবে কবিতার মর্যাদা স্পষ্ট করে। তারা অন্য

(২ পাতার পর...)

ধর্মের জন্য যুদ্ধ ও রক্তপাত আজ হারাম।

সাইয়্যিদুল কাওনাইন মুস্তফা ঘোষণা দিয়েছেন-

ঈসা মসীহ যুদ্ধ স্থগিত করবেন। এই নির্দেশ শুনেও যে যুদ্ধ করবে, সে কাফিরদের হাতে চরম রাজয় ভোগ করবে।" (তুহফা গোলড়ভিয়া, পৃ. ৪০)

এখন আমরা পাঠকদের বিবেকের উপর ছেড়ে দিচ্ছি-১৯০০ সালের পর থেকে, যখন সত্য ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ হযরত মির্জা গুলাম আহমদ (আ.) তরবারির জিহাদের সমাপ্তির ফতোয়া দেন, জিহাদের নামে সংঘটিত কোনো যুদ্ধ কি মুসলমানদের বিজয় এনে দিয়েছে? নাকি মুসলমানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছে, একে অপরের রক্ত ঝরিয়েছে, জিহাদের নামে ইসলামকে কলঙ্কিত করেছে এবং মুসলিম শক্তিকে দুর্বল করেছে? চিন্তা করুন, গভীরভাবে ভাবুন।

হায়! যদি মুসলমানরা আল্লাহ-প্রেরিত এই সত্য প্রতিশ্রুত মসীহের হৃদয়স্পর্শী আহ্বান শুনত, তবে আজ মুসলমান মুসলমানের রক্ত ঝরাত না এবং তাদের শক্তি গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত হতো।

অতএব, আসুন "হাকাম ও আদল-এর ন্যায়নিষ্ঠ সিদ্ধান্তসমূহের দিকে অগ্রসর হই। তাঁর আরও কয়েকটি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পরবর্তী সংখ্যায় আলোচনা করা হবে, ইনশা'আল্লাহ। আর তাওফীক একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই।

****

কোনো যুক্তিতর্কে না গিয়ে ঘোষণা করে যে তারা এসেছে কেবল তাদের কবি ও নবীর কবির মধ্যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে। অতঃপর তারা তাদের কবিকে দাঁড় করায়, যিনি নিজ গোত্রের প্রশংসায় কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করেন। তখন মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মুসলমানদের পক্ষ থেকে হাসান ইবনে সাবিত (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে দাঁড়ানোর নির্দেশ দেন। তিনি নবী ও তাঁর সাহাবিদের প্রশংসায় শক্তিশালী কবিতা আবৃত্তি করেন, যার বাগ্মিতায় বনু তামিম মুগ্ধ ও পরাস্ত হয়। পরবর্তীতে সেই গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। (সীরাত খাতামুন নবিয়্যীন, পৃ. ৫৩-৫৫, প্রকাশিত কাদিয়ান, ২০০৬ (ক্রমশ)

(২৩ পাতার পর...)

নিমগাছ ছিল। যেহেতু বর্ষাকাল ছিল, তাই গাছের পাতাগুলো অত্যন্ত সতেজ ও সবুজ লাগছিল। হুযূর (আ.) আমাকে বলেন, 'হাজী সাহেব, এই গাছের পাতাগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন! কত সুন্দর লাগছে।' হাজী সাহেব বলেন, সেই সময়ে আমি লক্ষ করি যে, তাঁর চোখ অশ্রুতে পরিপূর্ণ ছিল।" (সীরাতুল মাহদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৯৫)

আল্লাহ্ তা'লার মহিমা এবং তাঁর ভালোবাসা তাঁর মনে জেগে উঠেছিল, আর সে কারণেই ঐ সময় তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়েছিল।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "এখানে এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি পরে খুবই নিষ্ঠাবান আহমদী হয়েছিলে এবং হযরত সাহেবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু আহমদী হবার পূর্বে হযরত সাহেব তাঁর প্রতি বিশ বছর অসন্তুষ্ট ছিলেন। এর কারণ ছিল, হযরত সাহেব তার একটি কথায় চরম অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। বিষয়টি এমন ছিল যে, তার এক ছেলে মারা গিয়েছিল। হযরত সাহেব নিজ ভাইয়ের সাথে তাদের কাছে শোক প্রকাশ করতে গেলেন, সমবেদনা জানাতে গেলেন। তাদের রীতি ছিল, ঘনিষ্ঠ কোনো বন্ধু আসলে তাকে আলিঙ্গন করে কান্না করত এবং চিৎকার করত। সে অনুযায়ী তিনি হযরত সাহেবের বড়ো ভাইকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আল্লাহ্ আমার প্রতি ভীষণ অন্যায় করেছেন! এটি শুনে হযরত সাহেবের এত বিতৃষ্ণা হলো যে, তিনি তার চেহারাও দেখা পছন্দ করতেন না। পরবর্তীতে আল্লাহ্ তা'লা সেই ব্যক্তিকে সুযোগ দেন এবং তিনি এসব অজ্ঞতাপূর্ণ কাজ থেকে বিরত হন।"

(তকদীরে ইলাহি, আনোয়ারুল উলুম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬০৬-৬০৭)

যুগ ইমামের বাণী

অতএব, কুরআন শরীফ অনুধাবন করা এবং সেই অনুযায়ী হিদায়াত লাভের জন্য তাকওয়া প্রধান ও আবশ্যক বিষয়।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২১)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Rafiquddin Ahmad & Afifa Begum, From- Lutful Haque Sb., Kandi (MSD)

ইসলাম বিরোধীদের আপত্তিহসমূহের উত্তরে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর লেখনীর জিহাদ

হাফিজ সৈয়্যদ রসুল নিয়াজ, মুরুব্বী সিলসিলা নশর ইশাআত, কাদিয়ান

প্রতিশ্রুত মসীহ হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস্ সালাম) তাঁর খোদা প্রদত্ত ও ঐশীভাবে নির্ধারিত মিশনের প্রচারের দায়িত্ব পূর্ণ সাহস, প্রজ্ঞা ও অবিচলতার সঙ্গে সম্পাদন করেছিলেন। তিনি সত্যের বাণী মানবজাতির কাছে কার্যকরভাবে পোঁছে দেওয়ার জন্য সম্ভাব্য প্রতিটি মাধ্যম ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু যখন তাঁর বিরোধীরা বিদ্বেষকে চরম পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে পক্ষপাত, হঠকারিতা ও অজ্ঞতার আশ্রয় নিল এবং যুক্তির পরিবর্তে গালি, উপহাস ও অপবাদকে অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করল, তখন প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক অঙ্গনে বিশ্বকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ জানান, যাতে সত্যকে চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

এগুলো ছিল ঐতিহাসিক ও অসাধারণ চ্যালেঞ্জ, যা আধ্যাত্মিক জগতে বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধন করে এবং এমন সব ঐশী নিদর্শনের প্রকাশ ঘটায় যে মানুষ হতবাক হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, এই চ্যালেঞ্জসমূহ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সেই মহান ভবিষ্যদ্বাণীর উজ্জ্বল বাস্তবায়ন ছিল যে, মসীহ ও মাহদী সম্পদ বিতরণ করবেন, কিন্তু তা গ্রহণ করার মতো কেউ থাকবে না। প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) মহিমান্বিত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর বিরোধীদের প্রতিযোগিতার ময়দানে আসার জন্য সর্বজনীন আহ্বান জানান এবং শত শত বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি বিপুল অঙ্কের আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেন।

এই চ্যালেঞ্জসমূহ সে যুগের সকল প্রসিদ্ধ মুসলিম আলেম, খ্রিস্টান যাজকবৃন্দ, হিন্দু পণ্ডিত, আর্য সমাজের নেতৃবৃন্দ এবং এমন প্রত্যেক ব্যক্তির সামনে পেশ করা হয়, যারা ইসলাম, ইসলামের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ (সা.), পবিত্র কুরআন এবং প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর সমর্থনে প্রকাশিত ঐশী নিদর্শনের ঐশ্বরিকতা সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহ পোষণ করত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এসব চ্যালেঞ্জের সামনে কোনো বিরোধীই দাঁড়াতে পারেনি এবং শেষ পর্যন্ত সত্য সুস্পষ্টভাবে বিজয়ী হয়েছে।

ইসলামের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যখনই এই পবিত্র ধর্ম বহিঃশক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক বা সামরিক আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে, তখনই আল্লাহ তাআলা তাঁর অনুগ্রহে এমন উলেমা ও আওলিয়াদের আবির্ভূত করেছেন, যারা সাহস, দূরদৃষ্টি ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে ইসলামের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে সত্যের এই উজ্জ্বল সারিতে সর্বাধিক বিশিষ্ট ও দীপ্তিমান নাম হলো প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী মাওউদ (আ.)-এর। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে-যখন ইউরোপ ও ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের বিরোধীরা অত্যন্ত বিষাক্ত, নির্ভীক ও সংগঠিত মতবাদ কেন্দ্রিক আক্রমণ শুরু করেছিল-তিনি কলমের জিহাদের ভিত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং বিশ্বকে জানান যে বর্তমান যুগের প্রকৃত জিহাদ তলোয়ার দ্বারা নয়, বরং যুক্তি, প্রমাণ ও জ্ঞানের আলোর মাধ্যমে পরিচালিত হওয়াই নির্ধারিত।

খ্রিস্টান মিশনারিরা লক্ষ লক্ষ পুস্তিকা, গ্রন্থ ও সাময়িকী প্রকাশ করে ইসলাম, পবিত্র কুরআন ও মহানবী (সা.)-এর অবমাননার ঝড় তুলেছিল। আর্য সমাজের নেতারা ইসলামের বিরুদ্ধে অবমাননাকর ও বিভ্রান্তিকর আপত্তির সয়লাব সৃষ্টি করেছিল। প্রকৃতিবাদ ও নাস্তিকতার আন্দোলন মুসলমানদের মৌলিক বিশ্বাসকে টলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। এমন বিপজ্জনক ও সংকটময় সময়ে মুসলমানরা জ্ঞান ও ধর্মীয় শক্তির দিক থেকে অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় ছিল এবং কোনো কার্যকর রক্ষাকর্তা দৃশ্যমান ছিল না।

এইরূপ অন্ধকার ও অশান্ত সময়ে আল্লাহ তাআলা প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-কে প্রেরণ করেন, যাতে তিনি ইসলামের শত্রুদের বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণের গতিপথ পরিবর্তন করেন, অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে ইসলামের মহিমা ও সত্যতা প্রমাণ করেন এবং বিশ্বকে দেখিয়ে দেন যে ইসলাম একটি জীবন্ত ধর্ম।

প্রতিশ্রুত মসীহের জিহাদ-ধারণা

জিহাদের শিক্ষা একজন মুমিনের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে সম্পর্কিত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জিহাদ তাঁর শৈশব থেকে শুরু হয়ে বার্ধক্য পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এই জিহাদ চলমান ছিল জাবালুন নূর পর্বতের হেরা গুহায়, এমন এক মহিমায় যে আল্লাহর ফেরেশতারাও তাতে আনন্দিত হতেন। এটি অব্যাহত ছিল তখনও, যখন তিনি একাকী পবিত্র কাবাঘরে প্রবেশ করে তাঁর প্রতিপালকের সঙ্গে নিবিড় প্রার্থনায় নিমজ্জিত হতেন। এটি তায়েফের উপত্যকায়ও চলমান ছিল, যখন তিনি নিঃসহায় অবস্থায় রক্তাক্ত শরীরে এই দোয়ায় মগ্ন ছিলেন: "হে আল্লাহ! আমার জাতিকে হিদায়াত দাও, কারণ তারা জানে না।" এটি সাওর গুহাতেও অব্যাহত ছিল; তদ্রূপ রাতের দীর্ঘ ইবাদতের সময়ও, যখন বর্ণনা অনুযায়ী দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার ফলে তাঁর পদযুগল ফুলে যেত এবং ফেটে যেত। এই জিহাদ তার চূড়ান্ত পরিণতি ও পরিপূর্ণতায় পোঁছায় তখন, যখন তিনি প্রত্যেক চোখকে অশ্রুসিক্ত রেখে "রফীকুল আ'লা, রফীকুল আ'লা" উচ্চারণ করতে করতে তাঁর প্রতিপালকের সান্নিধ্যে উপস্থিত হন।

(প্রতিশ্রুত মসীহের জিহাদ-ধারণা, পৃ. ১-২)

হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) বলেন-

মূল কথা এই যে, পবিত্র নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর যুগে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁর বহু নিবেদিত প্রাণ সাহাবি ও প্রিয় সঙ্গী নিষ্ঠুর কাফিরদের তীর-তরবারির লক্ষ্যবস্তু হয়েছিলেন। মুসলিম পুরুষ ও নারীদের ওপর তারা লজ্জাজনক ও নানাবিধ নির্মম নির্যাতন চালায়। অবশেষে তারা স্বয়ং মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। তাঁকে অনুসরণ করা হয়, এমনকি তাঁকে হত্যা করতে পারলে পুরস্কার ঘোষণাও করা হয়। তিনি একটি গুহায় আশ্রয় নেন। তাঁকে খুঁজে বের করতে কোনো প্রকার ত্রুটি করা হয়নি। কিন্তু এটি ছিল আল্লাহ তাআলার বিশেষ ব্যবস্থাপনা যে, শত্রুরা নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে দেখতে পায়নি। আল্লাহ যেন তাদের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করেন এবং নিজ হাতে তাঁর রসূলকে রক্ষা করেন।

যখন এদের অত্যাচার সীমা অতিক্রম করে এবং মুসলমানদেরকে স্বদেশ থেকে বিতাড়িত করেও তারা ক্ষান্ত হয়নি, তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এ নির্দেশ অবতীর্ণ হয়:

"যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো, কারণ তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে; আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সর্বশক্তিমান।"

(সূরা আল-হজ্জ ২২:৪০)

এভাবে মুসলমানদেরকে তরবারি ধারণের অনুমতি দেওয়া হয়। এই অনুমতির মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে তারাই ছিল নির্যাতিত, শত্রুদের আগ্রাসন সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং মুসলমানদের ধৈর্য চরম সীমায় পোঁছেছিল। আল্লাহ ঘোষণা করেন যে যারা তরবারি তুলে আক্রমণ করেছে তারা তরবারির দ্বারাই ধ্বংস হবে। মুসলমানরা যদিও সংখ্যায় অল্প ও দুর্বল ছিল, তবুও আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দেন যে তারা যেহেতু অত্যাচারিত ও নির্যাতিত, তাই তিনি তাদের সাহায্য করবেন এবং তাদের হাতেই শত্রুদের পরাজিত করবেন।

অতঃপর দেখা গেল, যাদের তুচ্ছ ও অসহায় মনে করা হতো, বাহ্যত যাদের কোনো সমর্থক ছিল না এবং যারা চরম নির্যাতনের শিকার ছিল, তারাই পূর্ব ও পশ্চিমে প্রভাব বিস্তার করল। এভাবেই আল্লাহ তাদের সাহায্যের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে প্রমাণ করে দিলেন যে তারাই ছিল প্রকৃতপক্ষে নির্যাতিত।

প্রত্যেক দিক থেকে বিচার করে দেখুন-সেই সময় মুসলমানরা কি প্রকৃতপক্ষে নির্যাতিত ছিল না? এমন বিপজ্জনক ও সংকটময় অবস্থায় যদি আল্লাহ তাদের আত্মরক্ষার জন্য তরবারি ধারণের অনুমতি না দিতেন, তবে কি তারা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত না? এমন পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষা করা কি শরীয়ত ও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ছিল না? অথচ আজও এই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়, এবং পক্ষপাতদুষ্ট ও অজ্ঞ শত্রুরা তা ভুলতে চায় না।

তাহলে কি "খুনি মাহদী-র ধারণা প্রচার করে সেই পুরোনো আপত্তিগুলোকে আবার জীবিত করা এবং মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে? মহানবী (সা.) নিজেই মাহদী সম্পর্কে স্পষ্ট বলেছেন যে তিনি যুদ্ধের অবসান ঘটাবেন (ইউযাউল হারব)। তাঁর যুদ্ধ হবে যুক্তি ও চিন্তাধারার যুদ্ধ। কলম তরবারির স্থলাভিষিক্ত হবে। আধ্যাত্মিক রহস্য, স্বর্গীয় আশিস ও ঐশী নিদর্শনের মাধ্যমে বিশ্ব জয় করা হবে। অদৃশ্যের বিষয়ে নতুন নতুন ভবিষ্যদ্বাণী ও ঐশী সাহায্যের দ্বারা সত্য ধর্মকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করা হবে।

শুধু একথা বলা যথেষ্ট নয় যে আমাদের কাছে অতীতের মুজিজা রয়েছে। মনে রাখবেন, হিন্দু, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের কাছেও কাহিনী ও বর্ণনায় পূর্ণ গ্রন্থ রয়েছে। আপনি যদি গল্প উপস্থাপন করেন, তারা আরও বেশি গল্প উপস্থাপন করতে পারে। যদি ইসলামের সত্যতাও কেবল কাহিনির ওপর নির্ভরশীল হয়, তবে বিষয়টি সন্দেহাতীত থাকে না।

কিন্তু ইসলাম 'ফুরকান'-সত্য-মিথ্যার সুস্পষ্ট মাপকাঠি-ধারণ করে। আল্লাহ সর্বদা ইসলামের মধ্যে অসাধারণ নিদর্শন সংরক্ষণ করেছেন এবং আজও নতুন নতুন নিদর্শন প্রকাশিত হচ্ছে। আধুনিক দর্শনপন্থীরা 'নিদর্শন'-এর কথা শুনে অস্বস্তি বোধ করে। তারা বলে, আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণে নবী বা নিদর্শনের কী প্রয়োজন?

কিন্তু স্মরণ রাখুন-এই সৌরজগৎ ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সুশৃঙ্খল বিন্যাস থেকে আল্লাহর অস্তিত্ব অনুমান করা দুর্বল ঈমান। এতে সর্বোচ্চ সম্ভাবনা

প্রমাণিত হয়, নিশ্চিততা নয়। "থাকা উচিত" আর "আছে-এই দুইয়ের মধ্যে বিশাল পার্থক্য। 'আছে' প্রমাণের জন্য প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। যদি কেবল যুক্তিগত প্রমাণই চূড়ান্ত হতো, তবে নাস্তিকেরা কেন থাকত? বড় বড় গবেষক গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু তাদের যুক্তি অপরাজেয় নয়; তা মানুষের মুখ বন্ধ করতে পারে না এবং নিশ্চিত ঈমান সৃষ্টি করতে পারে না। একজন যদি প্রকৃতির নিয়ম থেকে আল্লাহর অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি দেয়, একজন বস্তুবাদী তার বিপরীতে যুক্তি দিতে পারে।

আসলে এভাবে সর্বোচ্চ এটুকুই প্রমাণ হয় যে আল্লাহ থাকা উচিত-এ নয় যে তিনি আছেন। আল্লাহর অস্তিত্বের দৃঢ় ও নিশ্চিত প্রমাণ হলো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। নবীগণ এই দ্বিতীয় পথই উপস্থাপন করেছেন-মহান নিদর্শন, মুজিজা ও আল্লাহর শক্তির প্রকাশ, যা তাঁর জীবন্ত অস্তিত্বকে প্রমাণ করে। এমন প্রমাণের সামনে সকলেই নতমস্তক হয়।

ইসলামের পূর্বে বহু আরব বস্তুবাদী ছিল, যেমন কুরআনের আয়াতে উল্লেখ আছে:

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَا

"আমাদের জীবন তো কেবল এই দুনিয়ার জীবন; আমরা মরি এবং বাঁচি।" (সূরা আল-মুমিনুন ২৩:৩৮)। আরবদের মত সেই বর্বর, উচ্‌শৃঙ্খল ও অসংযত জাতি কি কেবল তরবারির মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়েছিল? তাদের মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বের এবং পরবর্তী জীবনের বিশাল পার্থক্য কি কেবল যুদ্ধে পরাজয়ের ফল ছিল? অথবা কি কেবল নিরস নৈতিক শিক্ষাই তাদের হৃদয়ে এমন পবিত্র পরিবর্তন আনতে পেরেছিল? কখনোই নয়।

তরবারি মানুষের বাহ্যিক দিক জয় করতে পারে, কিন্তু হৃদয় কখনো তরবারি দ্বারা জয় হয় না। যে নূর আল্লাহর মুখমণ্ডলের প্রতিফলন বহন করত, সেই আধ্যাত্মিক আলোকই তাদের মধ্যে এমন বৈপ্লবিক পরিবতন সাধন করেছিল। মহানবী (সা.) তাদের এমন সব অসাধারণ নিদর্শন দেখিয়েছিলেন যে আল্লাহ যেন তাদের সামনে মূর্তমান হয়ে উঠেছিলেন। আল্লাহর মহিমা ও প্রতাপ প্রত্যক্ষ করে তারা পাপ-দগ্ধ জীবন ত্যাগ করে পবিত্রতার জীবন লাভ করেছিল।

(মালফুযাত, খণ্ড ১০, পৃ. ৩০৯-৩১৩, ১৯৮৪ সংস্করণ)

তিনি বারবার ঘোষণা করেছেন যে বর্তমান যুগের জিহাদ তরবারির মাধ্যমে নয়, বরং কলমের মাধ্যমে। এই মতবাদের লড়াইয়ে তাঁর অবদান ইসলামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

পবিত্র কুরআনের প্রতিরক্ষা ও তার সত্যতার উজ্জ্বল প্রমাণ

তিনি তাঁর রচনাবলিতে প্রমাণ করেছেন যে পবিত্র কুরআন পূর্ণাঙ্গ ও অবিকৃত গ্রন্থ। তিনি এর জ্ঞানগত, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিস্ময়সমূহ ব্যাখ্যা করেছেন এবং কুরআনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তিগুলোর বৈজ্ঞানিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ জবাব প্রদান করেছেন। তাঁর যুগান্তকারী গ্রন্থ বারাহীনে আহমদীয়া এ ক্ষেত্রে এক মাইলফলক, যাকে অনেক আলেম "ইসলামী জ্ঞানের বিশ্বকোষ" বলে অভিহিত করেছেন।

মহানবী (সা.)-এর চরিত্র ও শ্রেষ্ঠত্বের অতুলনীয় প্রতিরক্ষা

প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) শত্রুদের ধৃষ্টতাপূর্ণ আক্রমণের জবাব প্রজ্ঞা, গবেষণা ও শক্তিশালী যুক্তির মাধ্যমে প্রদান করেন। নবী (সা.)-এর সীরাত ও মর্যাদা রক্ষায় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে চশমা-এ-মা'রিফাত, বারাহীনে আহমদীয়া, নূরুল হক, সুরমা চাশমে আরিয়া প্রভৃতি, এবং আরও আশির অধিক গ্রন্থ। এগুলো আজও ইসলামের মর্যাদা ও রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্বের জীবন্ত সাক্ষ্য বহন করে। তিনি প্রমাণ করেছেন যে শত্রুরা যত আপত্তিই উত্থাপন করুক না কেন, মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তা এমন এক নূরের মিনার, যাকে কোনো ঝড় নিভিয়ে দিতে পারে না।

বাতিল ধর্মসমূহের বুদ্ধিবৃত্তিক দুর্বলতার উন্মোচন

প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.) গভীর যুক্তির মাধ্যমে খ্রিস্টধর্মের মনগড়া মতবাদ, আর্য সমাজের কুসংস্কার, ব্রাহ্ম আন্দোলন ও প্রকৃতিবাদের তত্ত্বসমূহ খণ্ডন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ,সুরমা চাশমে আরিয়া গ্রন্থে তিনি আর্য মতবাদের যৌক্তিক দুর্বলতা উন্মোচিত করেন। ইযালা-এ-আওহাম-এ তিনি মিশনারিদের আপত্তির বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিসঙ্গত জবাব দেন। তুহফা গোল্ডবিয়া ও ফতেহ ইসলাম-এ তিনি প্রতিষ্ঠা করেন যে ইসলামই একমাত্র জীবন্ত ধর্ম, যা যুগের সকল চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে সক্ষম।

আধ্যাত্মিক নবজাগরণ: ওহী, দোয়া ও ঐশী নিদর্শনের মাধ্যমে জিহাদ

কলমের মাধ্যমে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামের পাশাপাশি প্রতিশ্রুত মসীহ এক গভীর আধ্যাত্মিক জিহাদ পরিচালনা করেন। ওহী, ভবিষ্যদ্বাণী এবং দোয়ার গ্রহণযোগ্যতার মাধ্যমে তিনি তাঁর বিরোধীদের কাছে স্পষ্ট করে দেন যে আল্লাহ আজও জীবিত এবং ইসলাম তাঁর জীবন্ত নিদর্শন। হযরত মির্জা গুলাম আহমদ (আ.)-এর প্রতি প্রদত্ত ঐশী নিদর্শনসমূহ তাঁর সকল বিরুদ্ধবাদীদের ষড়যন্ত্রের ওপর বিজয়ী হয়। আবদুল জব্বার গুলাম দস্তগীর , লেখরাম, আথাম এবং জন আলেকজান্ডার ডুই প্রমুখ বিরোধীরা ঐশী ফয়সালার কবলে পতিত হন এবং ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত তাদের কণ্ঠস্বর শেষ পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে যায়।

প্রতিশ্রুত মসীহ ঘোষণা করেন যে ইসলামের প্রকৃত শক্তি তলোয়ার বা বলপ্রয়োগে নয়, বরং বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্বে নিহিত। তিনি এক নতুন যুগের সূচনা করেন এবং ঘোষণা দেন যে তিনি তলোয়ার নিয়ে নয়, বরং যুক্তি ও প্রমাণ নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ইসলামের যৌক্তিক ও আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব পূর্ণ জ্যোতিতে বিশ্বমঞ্চে উদ্ভাসিত হয়। বিরোধীদের আপত্তিসমূহ ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যায়; যুক্তি ও প্রমাণের শক্তির সামনে মিথ্যার প্রাসাদ কেঁপে ওঠে, আর সত্য এমন মহিমায় প্রকাশিত হয় যে মুসলমানরা যুক্তিনির্ভর বিশ্বাসের ভিত্তিতে নতুন সম্মান, অবিচলতা ও আত্মবিশ্বাস লাভ করে। আহমদিয়া জামাআতের মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামের বার্তা পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে পৌঁছাতে শুরু করে, যা হৃদয়ে নতুন জীবন সঞ্চার করে এবং চিন্তায় নতুন চেতনা জাগ্রত করে।

হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট করে দেন যে প্রকৃত জিহাদ তলোয়ার দিয়ে নয়, বরং কলম, দোয়া ও উত্তম নৈতিক আচরণের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। তাঁর জীবন ছিল এ নীতির এক জীবন্ত ব্যাখ্যা-বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রাম জয় করা হয় যুক্তির মাধ্যমে, আধ্যাত্মিক যুদ্ধ জয় করা হয় দোয়ার মাধ্যমে এবং হৃদয় জয় করা হয় মহান চরিত্রের মাধ্যমে। এ ছিল সেই জিহাদ, যা শতাব্দী প্রাচীন ভ্রান্ত ধারণাকে চূর্ণ করে বিশ্বের সামনে ইসলামের প্রকৃত রূপ উপস্থাপন করে।

দুঃখজনকভাবে, যেসব আলেম আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত ছিলেন, তারা কুরআন ও হাদিসের উজ্জ্বল দলিলসমূহ গ্রহণ করার পরিবর্তে অস্বীকার ও একগুঁয়েমির পথ বেছে নেন। তারা প্রতিশ্রুত মসীহের বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক মহিমা সহ্য করতে পারেননি এবং তাই বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন। একের পর এক যুক্তি উপস্থাপিত হয় এবং দলিল সম্পূর্ণ করা হয়; কিন্তু যখন হৃদয়ে পক্ষপাতের সিলমোহর পড়ে যায়, তখন হিদায়াতের আলো কীভাবে অবতীর্ণ হতে পারে?

তবুও প্রতিশ্রুত মসীহ পূর্ণ সততা, ধৈর্য ও প্রজ্ঞার সঙ্গে তাবলিগের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আলেম, পীর-মাশায়েখ এবং দরগাহর খাদেমদের আন্তরিক সহানুভূতির সঙ্গে সত্যের দিকে আহ্বান জানান। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আনজাম-এ-আথম-এ তিনি সমকালীন মুসলিম আলেম ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে মুবাহালার (দোয়ার মাধ্যমে ফয়সালার) চ্যালেঞ্জ জানান। এ চ্যালেঞ্জ ব্যক্তিগত জয় বা খ্যাতির জন্য ছিল না; বরং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে চূড়ান্ত পার্থক্য প্রতিষ্ঠার জন্য ছিল, যাতে আল্লাহ স্বয়ং সত্যকে প্রকাশ করেন।

অতএব, প্রতিশ্রুত মসীহের এই সাহসী ও বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক উদ্যোগ ইসলামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত-ন্যায়ের অনুসন্ধানীদের জন্য এক চিরস্থায়ী চিন্তার আহ্বান এবং সত্যসন্ধানীদের জন্য নিশ্চয়তার এক উৎস।

তিনি লিখেন:

"হে বিরোধী আলেমগণ ও দরগাহর খাদেমগণ! আমাদের মধ্যে এই বিরোধ সব সীমা অতিক্রম করেছে। যদিও তোমাদের তুলনায় এই জামাআত ছোট-বর্তমানে হয়তো চার বা পাঁচ হাজারের বেশি নয়-তবুও নিশ্চিত জেনে রাখো, এটি আল্লাহর হাতে রোপিত এক চারা গাছ। আল্লাহ কখনো এটিকে বিনষ্ট হতে দেবেন না। তিনি এটিকে পরিপূর্ণতায় পৌঁছানো পর্যন্ত সন্তুষ্ট হবেন না। তিনি এটিকে সিঞ্চিত করবেন, চারপাশে বেষ্টনী নির্মাণ করবেন এবং বিস্ময়কর উন্নতি দান করবেন। তোমরা কি সর্বশক্তি প্রয়োগ করোনি? যদি এটি মানুষের কাজ হতো, তবে এই বৃক্ষ বহু আগেই কেটে ফেলা হতো এবং এর কোনো চিহ্নই অবশিষ্ট থাকত না। তিনিই আমাকে তোমাদের সামনে মুবাহালার আবেদন পেশ করতে আদেশ দিয়েছেন।"

(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৬৪)

এই ঘোষণার পর ৮৩ জন খ্যাতনামা আলেম ও আধ্যাত্মিক নেতা এবং ৪৮ জন দরগাহর খাদেমের নিকট রেজিস্ট্রি ডাকযোগে মুবাহালার আমন্ত্রণ প্রেরণ করা হয়। আমন্ত্রণের সঙ্গে ২০৯ পৃষ্ঠাবিশিষ্ট প্রাঞ্জল আরবি ও ফারসি গ্রন্থ সংযুক্ত ছিল, যাতে ২৫৮টি কবিতার শ্লোক অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মুবাহালার শর্ত হিসেবে তিনি বলেন:

"আমার মুবাহালায় শর্ত হলো-উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে অন্তত দশজন উপস্থিত থাকতে হবে; এর কম নয়। সংখ্যা যত বেশি হবে, ততই আমার কাছে তা প্রীতিকর হবে, কারণ অনেককে একত্রে ঐশী শাস্তি পরিবেষ্টন করা এমন এক সুস্পষ্ট নিদর্শন যে কারো সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। হে ভূমি ও হে

আকাশ! সাক্ষ্য দাও যে, যে ব্যক্তি এই পুস্তিকা প্রাপ্তির পর না মুবাহালায় উপস্থিত হয়, না আমাকে কাফির ঘোষণা ও গালিগালাজ করা থেকে বিরত থাকে, না উপহাসের আসর থেকে নিজেকে পৃথক করে-তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৬৭)

মহান আল্লাহ বিভিন্ন সময়ে ওহীর মাধ্যমে প্রতিশ্রুত মসীহকে সব অবস্থায় ধৈর্য ও উত্তম চরিত্রে অবিচল থাকার নির্দেশ দেন। বিরোধীদের আচরণ যতই লজ্জাজনক বা ক্ষতিকর হোক না কেন, তাঁকে কখনো ধৈর্য ও অধ্যবসায় ত্যাগ না করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁকে দোয়ার মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করতে এবং ঐশী সাহায্যের প্রতীক্ষায় থাকতে বলা হয়। পরীক্ষা ও বিপদ আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে; কিন্তু তাঁর সত্যিকারের বান্দারা তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য তা সহ্য করেন। বরাহীন-এ-আহমদিয়া-তে তিনি এমনই এক ওহীর উল্লেখ করেছেন, যা দৃঢ়তা ও ঐশী সাহায্যের ওপর নির্ভরতার প্রতি নির্দেশ করে।

اَلْفِتْنَةُ هٰهُنَا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوالْعَزْمِ۔
اَلَآ اِنَّهَا فِتْنَةٌ مِّنَ اللّٰهِ لِيُحِبَّ حُبًّا جَمًّا۔ حُبًّا
مِّنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْاَكْرَمِ۔ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوْذٍ۔

"এখানে একটি ফিতনা রয়েছে; অতএব তোমরা উলুল আযমদের ন্যায় ধৈর্য ধারণ কর। সাবধান! এই ফিতনা আল্লাহর পক্ষ থেকে, যাতে তিনি সেই প্রেম দান করেন যা পরিপূর্ণ প্রেম-সেই আল্লাহর প্রেম, যিনি পরম সম্মানিত ও পরম মহিমান্বিত; এমন এক ক্ষমা, যার ধারাবাহিকতা কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না (অর্থাৎ যা কখনও শেষ হয় না)।"

(বরাহীন-এ-আহমদিয়া, তৃতীয় খণ্ড, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড ১, পৃ. ৬০৯-৬১০, হাশিয়া নং ৩)

হযরত খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আই) বলেন: "অতএব নবুওয়াতের দাবি করার আগেই, এমনকি বাই'আত গ্রহণের পূর্বেই, বরং একেবারে সূচনালগ্ন থেকেই আল্লাহ তাআলা তাঁকে ধৈর্যের পরম গুণের শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। সেই শিক্ষার প্রকাশ ও তার কর্মকাণ্ড তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এর কিছু উদাহরণ, যেমন আমি বলেছি, আমি উপস্থাপন করব।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব ইরফানী (রহ.) বর্ণনা করেন যে, ১৮৯৮ সালে একবার মাওলভী মুহাম্মদ হুসাইন গালিগালাজে পরিপূর্ণ একটি পুস্তিকা প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)-এর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে লিখেছেন যে ২৭ জুলাই ১৮৯৮ সালের আল-হাকাম পত্রিকায় তিনি এই ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে প্রায় ত্রিশ বছর পর যখনই তিনি সেই বিবরণ পুনরায় পাঠ করেন এবং প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)-এর সহনশীলতা, আত্মসংযম এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ মনোযোগের বিষয়টি চিন্তা করেন, তখন তাঁর চোখ থেকে অশ্রু অনিয়ন্ত্রিতভাবে ঝরতে থাকে।

(সীরাত হযরত মসীহ মওউদ - মাওলানা ইয়াকুব আলী ইরফানী, পৃ. ৪৬২-৪৬৩; জুমার খুতবা, ২৬ নভেম্বর ২০১০)

উপরোক্ত তথ্য, উদ্ধৃতি ও ঐতিহাসিক প্রমাণের আলোকে পূর্ণ স্পষ্টতার সঙ্গে প্রতীয়মান হয় যে প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)-এর জিহাদ কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ছিল না, এবং তা তলোয়ার বা সহিংসতার ওপর প্রতিষ্ঠিত কোনো আন্দোলনও ছিল না। বরং এটি ছিল সম্পূর্ণরূপে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং ঐশী নির্দেশনাপ্রাপ্ত সংগ্রাম, যার ভিত্তি ছিল ধৈর্য, দোয়া, যুক্তিনির্ভর দলিল এবং উন্নত নৈতিক চরিত্র। তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে সংগঠিত বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণের মোকাবিলা করেছিলেন সেই অস্ত্র দ্বারা, যা সে যুগে সবচেয়ে কার্যকর ও সিদ্ধান্তমূলক ছিল-অর্থাৎ কলম, যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ এবং জীবন্ত ঐশী নিদর্শন।

প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম) শুধু এটিই সুস্পষ্ট করেননি যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এ যুগে জিহাদের প্রকৃত অর্থ হলো জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে জিহাদ এবং কুরআনের মাধ্যমে জিহাদ; বরং তিনি প্রমাণ করে দেখান যে ইসলামের প্রকৃত শক্তি তার জীবন্ত সত্য, আল্লাহর সমর্থন এবং আধ্যাত্মিক প্রভাবশীলতার মধ্যে নিহিত-জবরদস্তি, সহিংসতা বা তলোয়ারের শক্তিতে নয়। তাঁর বৈজ্ঞানিক চ্যালেঞ্জ, মুবাহালার আহ্বান, ভবিষ্যদ্বাণী এবং দোয়া কবুল হওয়ার বিস্ময়কর ঘটনাবলি এবিবষয়ের অকাট্য প্রমাণ যে আল্লাহ আজও ততটাই জীবিত, যতটা তিনি অতীতে ছিলেন, এবং ইসলাম আজও সেই একই শক্তি ও সত্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত আছে, যেমনটি ছিল নবীর যুগে।

এটিও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তীব্র বিরোধিতা, গালিগালাজ, অপবাদ, হত্যার উদ্দেশ্যে দায়েরকৃত মামলা ও ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম) ধৈর্য, সহনশীলতা ও আত্মসংযমের এমন এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, যা মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহর প্রকৃত প্রতিফলন ছিল। শত্রুর প্রতিটি আঘাতের জবাবে তাঁর মুখ থেকে দোয়া উচ্চারিত হয়েছে; প্রতিটি অভিযোগের উত্তরে যুক্তিসম্মত প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে; এবং প্রতিটি ফিতনার সম্মুখে নৈতিকতার প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখা হয়েছে। এই পন্থাতিই শেষ পর্যন্ত অসত্যকে লাঞ্ছিত এবং সত্যকে বিজয়ী করেছে।

মুবাহালার আহ্বান, বৈজ্ঞানিক বিতর্ক, কলমি রচনা এবং আধ্যাত্মিক নিদর্শনসমূহ সম্মিলিতভাবে সাক্ষ্য দেয় যে প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম) আল্লাহ তাআলার প্রেরিত ব্যক্তি ছিলেন, যাঁকে বিশেষভাবে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল যে তিনি ইসলামের হারানো বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক মহিমা পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং বিশ্বকে প্রদর্শন করবেন যে ইসলাম একটি জীবন্ত ধর্ম, যা প্রত্যেক যুগের আপত্তির জবাব দেওয়ার পূর্ণ সক্ষমতা রাখে।

অবশেষে এই ফলাফল প্রতীয়মান হয় যে প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)-এর আগমন শুধু মুসলমানদের নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন দান করেনি, বরং এমন একটি জামাআতের ভিত্তি স্থাপন করেছে, যা যুক্তি, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে বিশ্বের সামনে প্রকৃত ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে। আহমদিয়া মুসলিম জামাআতের মাধ্যমে ইসলামের এই বার্তা আজ বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে যাচ্ছে, যা এই ঐশী প্রতিশ্রুতির বাস্তব প্রতিফলন যে আল্লাহ নিজেই তাঁর দ্বীনের হেফাজত করেন।

অতএব প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)-এর উপস্থাপিত জিহাদের আদর্শ ইসলামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায় -যা ন্যায়পরায়ণদের জন্য এক স্থায়ী প্রমাণ, বিদ্বানদের জন্য এক শক্তিশালী দলিল এবং মুমিনদের জন্য নিশ্চিততা ও প্রশান্তির এক অফুরন্ত উৎস হয়ে থাকবে।

'বদর' পত্রিকা নিজেও পড়ুন এবং আপনার বন্ধু-স্বজনদেরও পড়তে উৎসাহিত করুন

সাইয়্যিদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ খামিস, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আযীয) ডিসেম্বর ২০১৪-এর বিশেষ সংখ্যার জন্য 'বদর' পত্রিকার উদ্দেশ্যে প্রেরিত তাঁর বার্তায় বলেন:

"বদর-এর ব্যবস্থাপনা ও পাঠকদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে এই পত্রিকা জামা'আতের সদস্যদের রূহানী সংস্কার ও উন্নতির জন্য চালু করা হয়েছিল। আমাদের পূর্বসূরিরা প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও পরম নিষ্ঠা ও ত্যাগের সঙ্গে একে অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের দোয়া ও পবিত্র প্রচেষ্টার বরকতেই আজ পর্যন্ত এটি প্রকাশিত হয়ে আসছে। অতএব, এর দাবি হলো-যত বেশি সম্ভব আহমদী যেন এটি পড়েন এবং উপকৃত হন। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে বিশেষভাবে ভারতের আহমদীদের এবং সাধারণভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের আহমদীদের এ পত্রিকার নিয়মিত অধ্যয়ন ও এর বরকতসমূহ অর্জনের তাওফীক দান করুন। আমীন।"

সাইয়্যিদনা আমীরুল মু'মিনীন, খলীফাতুল মসীহ খামিস (আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আযীয)-এর এই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ নির্দেশনার আলোকে জামা'আতে আহমদিয়ার সদস্যদের নিকট বিনীত অনুরোধ করা হচ্ছে যে, প্রত্যেক ঘরে 'বদর' পত্রিকার নিয়মিত পাঠ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

'বদর' পত্রিকায় পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোচনা, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর উচ্চাঙ্গের বাণীসমূহের পাশাপাশি হুযূর আনওয়ারের জুমার খুতবা, বিভিন্ন ভাষণ এবং তাঁর বিভিন্ন দেশের বরকতময় সফরের অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও ঈমানবর্ধক প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশিত হয়- যা প্রত্যেক আহমদীর জন্য পাঠ করা অত্যাবশ্যক।

আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও সাইয়্যিদনা হুযূর আনওয়ার (আইয়্যাদাহুল্লাহু তা'আলা বিনাসরিহিল আযীয)-এর স্নেহধন্য তত্ত্বাবধানে এখন এই পত্রিকা উর্দুর পাশাপাশি হিন্দি, বাংলা, তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, উড়িয়া ও কন্নড় ভাষায়ও প্রকাশিত হচ্ছে।

যেসব আহমদী বন্ধু এখনো তাঁদের নামে 'বদর' পত্রিকা চালু করেননি, তাঁদের প্রতি অনুরোধ- নিজ নামে 'বদর' চালু করে নিজে নিয়মিত পাঠ করুন এবং আপনার সন্তান ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও এর পাঠের সুযোগ করে দিন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সাইয়্যিদনা আমীরুল মু'মিনীনের নির্দেশাবলী যথাযথভাবে ও তার প্রকৃত মর্মানুসারে পালন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

'বদর' সময়মতো না পৌঁছানো, চাঁদা পরিশোধ বা অন্য যেকোনো তথ্যের জন্য সাপ্তাহিক 'বদর' পত্রিকার অফিস ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ করুন।

জাযাকুমুল্লাহু খাইরান।

- সম্পাদকীয় বিভাগ

(নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)

হযরত মসীহে মওউদ (আ.)-এর তাবাররুকাত

লাঈক আহমদ নায়েক, মুরুব্বী সিলসিলা

আমি আমার উপর অবতীর্ণ সকল ওহীর প্রতি সেই একই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি, যে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে আমি তওরাত, ইঞ্জিল এবং কুরআন-এর প্রতি ঈমান রাখি।

আমি আমার উপর অবতীর্ণ সকল ওহীর প্রতি সেই একই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করি, যে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে আমি তওরাত, ইঞ্জিল এবং কুরআন-এর প্রতি ঈমান রাখি। আমি সেই মহান আল্লাহ্‌কে জানি ও চিনি, যিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন। এই পবিত্র ওহী থেকে আমি ততটাই পরিপূর্ণ অংশ লাভ করি, যতটা একজন মানুষ আল্লাহ্‌?র পূর্ণ নৈকট্যের অবস্থায় থেকে লাভ করতে পারে।

যখন কোনো মানুষ প্রগাঢ় প্রেমের অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়-যেমন সকল নবীগণ নিক্ষিপ্ত হয়েছেন-তখন তার ওহীর সঙ্গে বিভ্রান্ত স্বপ্ন বা ভ্রান্ত কল্পনা মিশ্রিত থাকে না। বরং যেমন শুকনো ঘাস ভাটিতে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, তেমনি সকল বিভ্রম ও নফসজাত চিন্তা দগ্ধ হয়ে বিলীন হয় এবং কেবল আল্লাহ্‌র খাঁটি ওহীই অবশিষ্ট থাকে। এই ওহী কেবল তাদেরই প্রদান করা হয়, যারা দুনিয়ায় পরিপূর্ণ পবিত্রতা, প্রেম ও আত্মবিলোপের মাধ্যমে নবীদের রঙে রঞ্জিত হয়ে যায়। অতএব, বারাহীন-এ-আহমদিয়া (পৃষ্ঠা ৫০৪, লাইন ১৮)-এ আমার সম্পর্কে এই ওহী লিপিবদ্ধ হয়েছে: "জারিয়ুল্লাহি ফি হুলালিল আম্বিয়া-অর্থাৎ নবীদের পোশাকে আল্লাহ্‌?র প্রেরিত এক ব্যক্তি।

সুতরাং, আমাকে সন্দেহজনক বা অনুমাননির্ভর ওহীসহ প্রেরণ করা হয়নি; বরং আমাকে নিশ্চিত ও চূড়ান্ত ওহীসহ প্রেরণ করা হয়েছে। আমি সেই আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যে আমাকে চূড়ান্ত প্রমাণসহ এই জ্ঞান দান করা হয়েছে এবং সর্বদা দান করা হয়-যে যা কিছু আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় এবং যে ওহী আমার উপর অবতীর্ণ হয়, তা আল্লাহ্‌?র পক্ষ থেকেই হয়, শয়তানের পক্ষ থেকে নয়। এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস ততটাই নিশ্চিত, যতটা সূর্য ও চন্দ্রের অস্তিত্বে আমার বিশ্বাস, অথবা যেমন আমি নিশ্চিত যে দুই আর দুই মিলে চার হয়।

হ্যাঁ, যখন আমি নিজের পক্ষ থেকে কোনো ইজতিহাদ করি বা কোনো ওহীর অর্থ নির্ধারণ করি, তখন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কখনো কখনো আমার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আমাকে সেই ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখা হয় না। আল্লাহ্‌র রহমত অচিরেই আমাকে প্রকৃত উন্মোচনের পথে পরিচালিত করে এবং আমার আত্মা আল্লাহ্‌?র ফেরেশতাদের কোলে লালিত-পালিত হয়।

(তাবলিগে রিসালাত, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৬৪-৬৫)।

যখন ত্রয়োদশ শতাব্দীর অবসান হলো এবং চতুর্দশ শতাব্দীর সূচনা হতে লাগল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে আমাকে অবহিত করলেন যে আমি এই শতাব্দীর মুজাদ্দিদ (সংস্কারক)। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আমার প্রতি এই ওহী নাযিল হয়েছিল-

"আর-রাহমানু 'আল্লামাল-কুরআন লিতুনযিরা কাওমান মা উনযিরা আবাউহুম ওয়া লিতাস্তাবীনা সাবীলাল-মুজরিমীন। কুল ইন্নী উমিরতু ওয়া আনা আউওয়ালুল-মু'মিনীন।"

অর্থাৎ, আল্লাহ্ তোমাকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন এবং তার প্রকৃত অর্থ তোমার নিকট উন্মোচিত করেছেন। এটি এ জন্য করা হয়েছে যে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে তাদের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করো, যারা বংশপরম্পরায় গাফিলতি ও সতর্কবাণীর অভাবে ভ্রান্তির মধ্যে পতিত হয়েছে; এবং যেন অপরাধীদের পথ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে-যারা হিদায়াত পৌঁছার পরও সৎপথ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়। তাদের বলো: আমি আল্লাহ্? কর্তৃক প্রেরিত (মা'মূর মিনাল্লাহ) এবং আমি মুমিনদের মধ্যে সর্বপ্রথম।

(কিতাবুল বারিয়্যাহ, পাদটীকা ২০১)।

যাঁর হাতে আমার প্রাণ সুরক্ষিত আমি সেই খোদার শপথ করে বলছি, আমি আমার পবিত্র খোদার নিঃসন্দেহ ও সুনিশ্চিত বাক্যালাপ দ্বারা সম্মানিত হয়েছি এবং প্রায় প্রত্যহই হচ্ছি। যিশু যে খোদাকে বলেছেন-'তুমি আমাকে কেন পরিত্যাগ করলে' সে খোদা আমাকে কখনো পরিত্যাগ করেন নি! মসীহ্‌র ন্যায় আমিও বহুবার আক্রান্ত হয়েছি কিন্তু প্রতি আক্রমণেই শত্রু অকৃতকার্য হয়েছে। আমাকে ফাঁসি দিতে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল কিন্তু যিশুর ন্যায় আমি ক্রুশবিদ্ধ হই নি। বরং প্রত্যেক বিপদেই খোদা, আমার খোদা আমাকে রক্ষা করেছেন। আমার জন্য তিনি বড় বড় অলৌকিক ঘটনা দেখিয়েছেন। তাঁর শক্তিশালী হাত প্রসার করেছেন। হাজার হাজার নিদর্শনের মাধ্যমে প্রমাণিত করেছেন যে, যিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন ও আঁ হযরত (সা.)-কে প্রেরণ করেছেন তিনিই প্রকৃত খোদা। আমি এ বিষয়ে ঈসা মসীহ্‌র কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্ব দেখতে পাইনি। তাঁর সম্বন্ধে যে অলৌকিক কাজ বর্ণিত আছে তদ্রূপ বরং তদপেক্ষা অধিকতর অলৌকিক কাজ ও ঘটনা আমাতেই পূর্ণ হচ্ছে। আমি এ সম্মান শুধু এক নবীকেই অনুসরণ করে লাভ করেছি। এ নবী আমাদের নবী ও নেতা হযরত মুহাম্মদ(সা.)। এ নবীর প্রকৃত মর্যাদা ও পদবী সম্বন্ধে পৃথিবী অজ্ঞ। যদিও জীবনের সব চিহ্ন শুধু হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এরই পাওয়া যায়, তথাপি মূর্খ অজ্ঞ লোকেরা বলে ঈসা আকাশে জীবিত আছেন। এটা বড়ই অদ্ভুত ও অবিচার। দুনিয়া যে খোদাসম্পর্কে অজ্ঞাত আমি সেই খোদাকে তাঁর নবীর মাধ্যমে অবলোকন করেছি এবং অন্যান্য জাতির ওপর যে 'ওহী-ইলহাম' বা ঐশীবাণীর দ্বার অবরুদ্ধ তা আমার ওপর কেবল এই নবীর বরকত ও কল্যাণে অবারিত করা হয়েছে। আর যে সব মু'জিযা অন্যান্য জাতি কেবল কল্প কাহিনী রূপে বর্ণনা করে থাকে আমি এই নবীর (সা.) মাধ্যমে সে-সব মু'জিযা দর্শন করেছি। আমি এই নবী (সা.)-এর সেই পদমর্যাদা প্রত্যক্ষ করেছি যার উর্ধ্বে আর কোন পদমর্যাদা নেই। আশ্চর্যের বিষয় দুনিয়া এ সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা বলে, কেন তুমি প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র দাবী করলে? কিন্তু আমি সত্য সত্য বলছি, এ নবীকে পূর্ণরূপে অনুসরণ করলে, ঈসা নবী কেন তাঁর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়াও সম্ভবপর। অন্ধেরা বলে, এটা কুফরী ও অবিশ্বাস্য। কিন্তু তোমরা যখন নিজেরাই বিশ্বাসরত্ন হারিয়েছ তখন কুফরী বা অবিশ্বাস কাকে বলে কিরূপে বুঝবে?

ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। সিরাতাল্লাযিনা আনআমতা আলাইহিম।

(সূরা আল্ ফাতিহা : ৬-৭) এর অর্থ অবগত থাকতে তবে এমন কুফরী ও অবিশ্বাসীর বাণী মুখে আনতে না। খোদা তা'লা তোমাদেরকে উৎসাহিত করে বলেছেন, তোমরা এ রসূলের পূর্ণ তাবেদারী করলে, রসূলদের বিভিন্ন কামাল ওপূর্ণগুণ একাধারে অর্জন করতে সমর্থ হবে। আর তোমরা শুধু এক নবীর কামাল ও পূর্ণগুণ লাভ করাকে কুফরী বলছো?

(চাশমায়ে মসীহি, পৃ: ২৭-২৮)

আমার প্রত্যাখ্যান কেবল আমার ব্যক্তিগত প্রত্যাখ্যান নয়; বরং তা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যাখ্যানের শামিল। কেননা যে ব্যক্তি আমাকে অস্বীকার করে, সে আমাকে অস্বীকার করার পূর্বেই-নাউযুবিল্লাহ-আল্লাহ্ তা'আলাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে ফেলে।

আমি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করছি যে "আল-হামদু"থেকে "ওয়ান-নাস" পর্যন্ত-অর্থাৎ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত-সমগ্র কুরআন পরিত্যাগ করতেই হবে। অতএব চিন্তা করো, আমার অস্বীকার কি কোনো তুচ্ছ বিষয়? আমি নিজ উদ্যোগে এ কথা বলি না; আল্লাহ্ তা'আলার শপথ করে বলছি, সত্য এটাই যে যে ব্যক্তি আমাকে ত্যাগ করে এবং আমার প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করে-সে মুখে তা স্বীকার না করলেও-তার কার্যকলাপের মাধ্যমে সমগ্র কুরআনকেই অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহ্‌কে পরিত্যাগ করেছে।

(মালফুযাত, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৪)।

যেসব অপবিত্র প্রকৃতির লোকেরা তাকফীর করার জন্য কোমর বেঁধেছে, তাদের বিপরীতে এমন অনেক ব্যক্তিও আছেন, যাঁরা স্বপ্নলোক বা রূইয়ার জগতে পবিত্র নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দর্শন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তাঁরা আল্লাহ্‌?র রাসূলের নিকট এই অধম ব্যক্তির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছেন, এবং তিনি ঘোষণা করেছেন যে এই ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং তাঁর দাবিতে সত্যবাদী। এ ধরনের বহু সাক্ষ্য আমাদের নিকট বিদ্যমান রয়েছে। যে ব্যক্তি এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু, সে আমাদের নিকট থেকে এর প্রমাণ গ্রহণ করতে পারে।

(জামিমা আঞ্জাম আতম, পৃষ্ঠা ৩৪৩)।

আমি সেই আল্লাহ্‌?র শপথ করে বলছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যে কুরআন-এর সত্যতত্ত্ব ও গভীর আধ্যাত্মিক জ্ঞান অনুধাবনের ক্ষেত্রে আমাকে প্রত্যেক আত্মার উপর প্রাধান্য প্রদান করা হয়েছে। কোনো বিরোধী মৌলভী যদি আমার মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়-যেমন আমি বারংবার তাদের কুরআনিক তাফসিরের জন্য আহ্বান করেছি-তবে আল্লাহ্ তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবেন। অতএব,

যুগ ইমামের বাণী

খোদা তোমাদের সঙ্গে থাকবেন, যদি তোমরা মুত্তাকি হও এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম পথসমূহে বিচরণ কর।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০০)

দোয়াপ্রার্থী: Sk.Fayjal Sb. and Family, Jaynagar, Bankura, WB

কুরআনের যে বোধশক্তি আমাকে দান করা হয়েছে, তা আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর এক বিশেষ নিদর্শন। আল্লাহ্?র অনুগ্রহে আমি আশা রাখি যে অচিরেই বিশ্ব প্রত্যক্ষ করবে যে আমি এ ঘোষণায় সত্যবাদী।

(সিরাজ মুনীর, পৃ. ৪১)

(১) আল্লাহ্ আমাকে কুরআনের গভীর তত্ত্বজ্ঞান দান করেছেন।

(২) আল্লাহ্ আমাকে কুরআনের ভাষায় বাগ্মিতা ও অলৌকিক প্রকাশক্ষমতা দান করেছেন।

(৩) আল্লাহ্ আমার দোয়াসমূহে অন্যদের তুলনায় অধিক গ্রহণযোগ্যতা স্থাপন করেছেন।

(৪) আল্লাহ্ আমাকে আসমান থেকে নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন।

(৫) আল্লাহ আমাকে জমিন থেকে নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন।

(৬) আল্লাহ্ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে যে-ই আমার মোকাবিলা করবে, সে পরাজিত হবে।

(৭) আল্লাহ্ আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে আমার অনুসারীরা সর্বদা তাদের সত্যতার প্রমাণে বিজয়ী থাকবে এবং দুনিয়াতে তারা ও তাদের বংশধরগণ বিপুল মর্যাদা লাভ করবে, যাতে প্রমাণিত হয় যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দিকে অগ্রসর হয়, সে কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হয় না।

(৮) আল্লাহ্ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে কিয়ামত পর্যন্ত এবং যতদিন দুনিয়ার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে, তিনি আমার বরকতসমূহ প্রকাশ করতে থাকবেন-এমনকি রাজাগণও আমার পোশাক থেকে বরকত অন্বেষণ করবে।

(৯) আজ থেকে কুড়ি বছর পূর্বে আল্লাহ্ আমাকে সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে আমাকে অস্বীকার করা হবে এবং মানুষ আমাকে গ্রহণ করবে না; কিন্তু তিনি বলেছেন: আমি তোমাকে গ্রহণ করব এবং প্রবল আক্রমণসমূহের মাধ্যমে তোমার সত্যতা প্রকাশ করব।

(১০) এবং আল্লাহ্ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে আমার বরকতের দ্বিতীয় নূর প্রকাশের জন্য তিনি আমার মধ্য থেকেই এবং আমারই বংশ থেকে একজন ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, যার মধ্যে তিনি রূহুল কুদুসের বরকত সঞ্চার করবেন। তিনি হবেন নির্মল স্বভাবের এবং আল্লাহ্র সঙ্গে অত্যন্ত পবিত্র সম্পর্কযুক্ত। তিনি হবেন সত্য ও মহিমার প্রতিচ্ছবি-যেন আসমান থেকে আল্লাহ্ অবতীর্ণ হয়েছেন। "ওয়া তিলকা 'আশারাতুন কামিলাহ।"

দেখ, সেই সময় আগত-বরং নিকটবর্তী-যখন আল্লাহ্ এই জামা'আতকে দুনিয়ায় মহান গ্রহণযোগ্যতা দান করবেন এবং এই আন্দোলন পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত হবে। পৃথিবীতে ইসলাম বলতে এই জামা'আতকেই বোঝানো হবে। এ কথা কোনো মানুষের উক্তি নয়; এটি সেই আল্লাহ্র ওহী, যাঁর সম্মুখে কোনো বিষয়ই অসম্ভব নয়।

(তুহফা গোলড়ভিয়্যাহ, পৃ. ৯০)।

আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে আমি ঈমানকে শক্তিশালী করি এবং মানুষের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব প্রমাণ করে প্রদর্শন করি। কেননা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ঈমানি অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছে, এবং পরকালকে কেবল একটি কল্পকাহিনী বলে মনে করা হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি তার কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রকাশ করছে যে দুনিয়া, দুনিয়ার মর্যাদা ও পদমর্যাদা সম্পর্কে তার যে দৃঢ় বিশ্বাস এবং দুনিয়াবি উপায়-উপকরণের উপর তার যে নির্ভরতা-আল্লাহ্ তা'আলা ও আখিরাতের প্রতি তার বিশ্বাস ও নির্ভরতা তেমন নয়। মুখে অনেক কথা উচ্চারিত হয়, কিন্তু অন্তরে দুনিয়ার প্রেমই প্রাধান্য বিস্তার করে আছে।

মসীহ ইহুদিদের এমনই অবস্থায় পেয়েছিলেন। ঈমানের দুর্বলতার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ তাদের নৈতিক অবস্থাও অত্যন্ত অধঃপতিত হয়ে গিয়েছিল এবং আল্লাহ্র প্রেম শীতল হয়ে পড়েছিল। আমার যুগেও একই অবস্থা বিরাজমান। অতএব আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে যাতে সত্য ও ঈমানের যুগ পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে এবং অন্তরে তাকওয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং এগুলোই আমার আবির্ভাবের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য। আমাকে জানানো হয়েছে যে আকাশ পুনরায় পৃথিবীর নিকটবর্তী হবে, বহু দূরে সরে যাওয়ার পর। অতএব আমি এই বিষয়গুলোরই মুজাদ্দিদ (সংস্কারক), এবং এ কাজসমূহ সম্পাদনের জন্যই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে।

(কিতাবুল বারিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ২৯৩-২৯৪)

এখন ইত্তামামুল হুজ্জতের জন্য আমি প্রকাশ করতে চাই যে, উপরে যা উল্লেখ করেছি তারই অনুরূপভাবে, আল্লাহ্? তা'আলা এই যুগকে অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখে, দুনিয়াকে গাফিলতি, কুফর ও শিরকে নিমজ্জিত অবস্থায় পর্যবেক্ষণ করে, এবং ঈমান, সত্যবাদিতা, তাকওয়া ও ন্যায়পরায়ণতা বিলুপ্তপ্রায় হতে দেখে আমাকে প্রেরণ করেছেন-যেন তিনি পুনরায় পৃথিবীতে জ্ঞানগত, কার্যগত, নৈতিক ও ঈমানি সত্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইসলামকে তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন, যারা দর্শনবাদ, প্রকৃতিবাদ, অবাধ্যতাবাদ, শিরক ও জড়বাদী নাস্তিকতার বেশ ধারণ করে এই ঐশী উদ্যানের ক্ষতি সাধন করতে চায়।

(আইনা কামালাতে ইসলাম, পৃষ্ঠা ২৫১)।

আমি রচনার সময়ও বিশেষভাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলার অলৌকিক অনুগ্রহের প্রকাশ প্রত্যক্ষ করি। কারণ যখনই আমি আরবি বা উর্দু ভাষায় কোনো বক্তব্য লিখি, তখন আমি অনুভব করি যেন অন্তর থেকে কেউ আমাকে শিক্ষা দিচ্ছে। আমার রচনা-তা আরবি, উর্দু বা ফারসি যেকোনো ভাষাতেই হোক-সর্বদা যেন দুই ভাগে বিভক্ত বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রথম অংশটি এই যে, অত্যন্ত সহজে শব্দ ও অর্থের একটি ধারাবাহিক প্রবাহ আমার সামনে উপস্থিত হতে থাকে এবং আমি কোনো প্রকার মানসিক কষ্ট বা চাপ অনুভব না করেই তা লিখে যেতে থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই ধারাটি আমার নিজস্ব মেধাশক্তির সীমা অতিক্রম করে না। অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ এমন প্রকৃতির হয় যে-যদিও কোনো বিশেষ রূপে ঐশী সমর্থনের প্রকাশ না-ও থাকত-তবুও তাঁর সাধারণ অনুগ্রহ, যা মানবীয় স্বভাবজাত ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত, তার বরকতে কিছু পরিশ্রম ও যথেষ্ট সময় ব্যয় করে আমি ঐ বিষয়সমূহ রচনা করতে সক্ষম হতাম। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।"

(নুযুলুল মসীহ, পৃ: ৫৩)

১৮৬৮ থেকে ১৮৬৯ সালের মধ্যেও উর্দু ভাষায় একটি আশ্চর্য ইলহাম (ঐশী প্রেরণা) হয়েছিল। সেটি এখানেই লিপিবদ্ধ করা সমীচীন মনে করি। ঐ ইলহামের প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে এই যে, মাওলভী আবু সাঈদ মুহাম্মদ হুসাইন সাহেব বাটালভী-যিনি একসময় এই অধমের সহপাঠীও ছিলেন-যখন নতুন নতুন মাওলভী হয়ে বাটালায় আগমন করেন এবং বাটালার লোকদের নিকট তাঁর কিছু মতামত অপ্রিয় বলে প্রতীয়মান হয়, তখন এক ব্যক্তি কোনো বিতর্কিত বিষয়ে মাওলভী সাহেবের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য এই তুচ্ছ ব্যক্তিকে অত্যন্ত অনুরোধ ও চাপ দিতে থাকে। অতএব তার অনুরোধে এক সন্ধ্যাবেলায় এই অধম ঐ ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে উক্ত সম্মানিত মাওলভী সাহেবের গৃহে গমন করে এবং তাঁকে তাঁর পিতাসহ মসজিদে উপস্থিত পায়।

সংক্ষেপে বলা যায়, সেই সময় মাওলভী সাহেবের বক্তব্য শ্রবণ করে এই নগণ্য ব্যক্তি বুঝতে পারে যে তাঁর বক্তব্যে এমন কোনো বাড়াবাড়ি বা আপত্তিযোগ্য বিষয় নেই যা নিয়ে বিতর্ক করা সমীচীন। অতএব আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিতর্ক পরিত্যাগ করা হয়। সেই রাত্রে পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাঁর ইলহাম ও সম্বোধনের মাধ্যমে এই বিতর্ক পরিত্যাগের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন: "তোমার এই কাজে তোমার প্রভু সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তিনি তোমাকে বিপুল বরকত দান করবেন; এমনকি রাজাগণ তোমার বস্ত্র থেকেও বরকত অন্বেষণ করবে।"

এরপর কাশফ (আধ্যাত্মিক দর্শন)-এর অবস্থায় ঐ সকল রাজাদের দেখানো হয়, যারা অশ্বারোহণ করে ছিলেন। যেহেতু সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করা হয়েছিল, তাই সেই পরম অনুগ্রহশীল সত্তা একে বিনা প্রতিদানে ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করেননি।

(বরাহীন আহমদিয়া, পৃষ্ঠা ৫৯৯, হাশিয়া দর হাশিয়া, নং ৩)

আমি দৃঢ় দাবি ও অবিচলতার সঙ্গে ঘোষণা করছি যে আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত

আমি দৃঢ় দাবি ও অবিচলতার সঙ্গে ঘোষণা করছি যে আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং আল্লাহ্? তাআলার অনুগ্রহে এই ময়দানে বিজয় আমারই। আমি যখন দূরদর্শী দৃষ্টিতে বিষয়সমূহ বিবেচনা করি, তখন সমগ্র বিশ্বকে আমার সত্যতার অনুকূলে অগ্রসর হতে দেখি। অচিরেই আমি এক মহিমান্বিত বিজয় লাভ করব, কেননা আমার জিহ্বার সমর্থনে আর-এক জিহ্বা কথা বলছে, এবং আমার হাতকে শক্তিশালী করার জন্য আর-এক হাত কার্যকর রয়েছে-যাকে দুনিয়া দেখে না, কিন্তু আমি দেখছি।

আমার অন্তরে এক স্বর্গীয় আত্মা কথা বলছে, যা আমার প্রতিটি শব্দ ও প্রতিটি অক্ষরকে প্রাণবন্ত করে তুলছে। আর আসমানে এক উত্তেজনা ও আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, যা এই মুঠো মাটিকে একটি পুতুলের ন্যায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি, যার জন্য তওবার দ্বার এখনও রুদ্ধ হয়নি, শীঘ্রই প্রত্যক্ষ করবে যে আমি নিজের পক্ষ থেকে নই।

সেই চোখ কি সত্যিই দৃষ্টিসম্পন্ন, যা একজন সত্যবাদীকে চিনতে পারে না? সে কি জীবিতও বটে, যে এই স্বর্গীয় আহ্বানের অনুভূতি লাভ করে না?

(ইজালাহ আওহাম, পৃষ্ঠা ৩০৩)

****

হযরত মসীহে মওউদ (আ.)-এর ইবাদতের প্রতি আগ্রহ

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন যে মানবসৃষ্টির মৌলিক উদ্দেশ্য একান্তভাবে তাঁর ইবাদত ও দাসত্ব। কুরআনুল কারীম এবং মানব ইতিহাসের গভীর অধ্যয়ন এ সত্যকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করে যে, এই মহান লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক উজ্জ্বল ও বিশিষ্ট ভূমিকা সর্বদা পালন করেছেন আল্লাহ্?র প্রেরিত মনোনীত বান্দাগণ ও তাঁর রাসূলগণ। তাঁরা সেই মহামানব, যাঁদের আল্লাহ্? তাআলা নিজ সন্তুষ্টির সুগন্ধে অভিষিক্ত করে মানবজাতির হিদায়তের জন্য নির্বাচন করেন। শৈশবকাল থেকেই তাঁদের হৃদয়ে আল্লাহ্?র প্রেম ও গভীর অনুরাগ দৃঢ়ভাবে প্রোথিত থাকে। তাঁদের স্বভাব এই প্রেমে এমনভাবে নিমজ্জিত হয়ে যায় যে, তাঁরা পার্থিব আসক্তি থেকে নির্লিপ্ত হয়ে দিবানিশি নির্জনে আল্লাহ্?র ইবাদতে মশগুল থাকেন। এই কারণেই তাঁরা বিশ্বের জন্য আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

অতএব, হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বরকতময় পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)-এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ্?র ইবাদতে নিমগ্ন এক সত্য ও ব্যাকুল প্রেমিকের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি উপস্থাপন করে। তাঁর জীবন পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তাঁর সমস্ত আগ্রহ ও মনোযোগের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু ছিল আল্লাহ্র দাসত্ব। তিনি এমন দীপ্তিময় ও জীবন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত আগত প্রজন্মের জন্য পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে। যদি আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে সেই নিভৃত অজ্ঞাত অবস্থা থেকে বের হয়ে তাওহীদের পতাকা উচ্চে ধারণ করার নির্দেশ না দিতেন, তবে তিনি একইভাবে ইবাদত ও বন্দেগিতেই জীবন অতিবাহিত করতেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! যদিও ইবাদতের ধারণা ব্যাপক এবং মানুষের সকল সৎকর্মই এর অন্তর্ভুক্ত, তথাপি এই প্রবন্ধে নামায (সালাত), রোযা এবং আল্লাহ্?র জিকিরের প্রেক্ষাপটে প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)-এর নির্জন ও প্রকাশ্য জীবনের কয়েকটি ঈমান-উদ্দীপক ঘটনা উপস্থাপন করা হবে।

শুরু থেকেই প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)-এর নামায ও জিকিরে ইলাহীর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক এবং এক স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল-যা আজীবন তাঁর হৃদয় ও মস্তিষ্কে প্রেমের এক মাদকতার ন্যায় বিরাজমান ছিল। তাঁর প্রারম্ভিক জীবনের ঘটনাবলির মধ্যে একটি বিস্ময়কর ঘটনা এই যে, অতি অল্প বয়সে তিনি তাঁর সমবয়সী এক কিশোরীকে (যিনি পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন) বলতেন, "দোয়া করো, আল্লাহ্ যেন আমাকে নামায নসীব করেন।" বাক্যটি আপাতদৃষ্টিতে সংক্ষিপ্ত হলেও, এর মধ্য দিয়ে তাঁর অন্তরে উথলে ওঠা আল্লাহ্ প্রেমের গভীর তরঙ্গসমূহের পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম) অল্প বয়স থেকেই মসজিদকে নিজের আবাসস্থল বানিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেন:

اَلْمَسَاجِدُ مَكَانِيْ وَالصَّالِحُوْنَ اِخْوَانِيْ وَذِكْرُ اللّٰهِ مَالِيْ وَخَلْقُ اللّٰهِ عِيَالِيْ۔

অর্থাৎ, "মসজিদসমূহই আমার আবাস; সৎলোকেরা আমার ভ্রাতা; আল্লাহ্র স্মরণই আমার ধন-সম্পদ; আর তাঁর সৃষ্টিই আমার পরিবার।"

(সীরাত হযরত মসীহ মওউদ, রচয়িতা: শাইখ ইয়াকুব আলী সাহেব ইরফানী, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪০২)

হযরত মির্জা বশীর আহমদ সাহেব (রহ.) লিখেছেন যে, "একজন শিখ জমিদার, যিনি একসময় আমাদের দাদার পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)-এর জন্য চাকরির প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন, বর্ণনা করেন যে একবার এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বা প্রভাবশালী ব্যক্তি আমাদের দাদা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শুনেছি আপনার একটি ছোট ছেলে আছে, কিন্তু আমরা তাকে কখনও দেখিনি।' আমাদের দাদা সাহেব (অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)-এর পিতা) মুচকি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, আমার একটি ছোট ছেলে আছে বটে, কিন্তু সে নতুন বিবাহিতা কনের মতো খুব কমই দেখা যায়। তাকে দেখতে চাইলে মসজিদের কোনো কোণে গিয়ে খোঁজ করুন। সে তো মসজিদেরই মানুষ।'

(সীরাত তাইয়্যিবা, রচয়িতা: হযরত মির্জা বশীর আহমদ সাহেব, এম.এ., পৃ. ৯-১০)

এই বর্ণনাটি মিরাজউদ্দীন উমর সাহেব আরও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন যে তাঁর পিতা বলতেন: "মসজিদে গিয়ে তাকে খোঁজ করো। সেখানে না পেলে নিরাশ হয়ে ফিরে এসো না। মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করে কোনো কোণে খুঁজে দেখো। যদি সেখানেও না পাও, তবুও হতাশ হয়ে ফিরে এসো না। কোনো কাতারের মধ্যে দেখো-হয়তো কেউ তাকে জড়িয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে; কারণ সে তো জীবিত থেকেও দুনিয়ার দৃষ্টিতে মৃতসদৃশ।"

(হযরত মসীহ মওউদের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত, রচয়িতা: মিরাজউদ্দীন উমর সাহেব, পৃ. ৬৭)

তাঁর খাদেম মির্জা ইসমাইল বেগ সাহেব বর্ণনা করেন যে হযরত মির্জা গোলাম মুর্তজা সাহেব (প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)-এর পিতা) কখনও কখনও তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতেন, "শোনো, তোমার মির্জা কী করে?" আমি বলতাম, "তিনি কুরআন পাঠ করেন।" তখন তিনি বলতেন, "সে কি কখনও শ্বাসও নেয়?" তারপর জিজ্ঞাসা করতেন, "সে কি রাতে ঘুমায়?" আমি উত্তর দিতাম, "হ্যাঁ, ঘুমানও, আবার উঠে নামাযও আদায় করেন।" তখন মির্জা সাহেব মন্তব্য করতেন, "সে তো সব পার্থিব সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছে। আমি অন্যদের দিয়ে কাজ নিই। অন্য ছেলেটি কতই না যোগ্য, কিন্তু সে অসুস্থ।"

(তারিখ-এ-আহমদিয়্যাত, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬৫)

এরপর এক হিন্দু পণ্ডিত দেবী রাম, যিনি ১৮৭৫ সালে সহকারী শিক্ষক হিসেবে কাদিয়ানে গিয়েছিলেন, বর্ণনা করেন যে মির্জা সাহেব পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায়ে নিয়মিত ছিলেন। তিনি রোযা রাখায় অভ্যস্ত ছিলেন এবং উৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী-ধার্মিক ও পরহেজগার ছিলেন।

(সীরাতুল মাহদী, খণ্ড ৩, পৃ. ১৭৯)

মির্জা সাহেব কখনও মসজিদে, কখনও একটি ছোট কক্ষে অবস্থান করতেন। তাঁর পিতা তাঁকে বলতেন, "গোলাম আহমদ, তুমি তো জানোই না সূর্য কখন উদয় হয় আর কখন অস্ত যায়; বসে থাকতে থাকতে সময় কীভাবে চলে যায় তাও তোমার খেয়াল থাকে না-আমি যখনই দেখি, তোমার চারপাশে বইয়ের স্তূপ জমে আছে।"

(সীরাতুল মাহদী, খণ্ড ৩, পৃ. ১৮২, ১৭৮)

অসুস্থতায় নামাযের প্রতি যত্ন

অসুস্থতা-বিশেষত গুরুতর অসুস্থতা-ঈমানের একটি পরীক্ষা। কারণ যখন মানুষের শক্তি-সামর্থ্য ক্ষীণ হতে থাকে, তখন তার মনোযোগ সাধারণত নিজের আরাম-আয়েশের দিকে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কিন্তু আল্লাহর মনোনীত বান্দাগণ এমন অবস্থাতেও ইবাদতে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন না। সুতরাং তীব্র অসুস্থতার সময়ও প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)-কে তাঁর স্রষ্টা ও প্রতিপালকের সামনে সেজদাবনত অবস্থায় দেখা যেত।

হযরত পীর সিরাজুল হক সাহেব নুমানী (রহ.) লিখেছেন: "আমি তিন মাস তাঁর খেদমতে ছিলাম। সে সময় হুযূর অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন, কিন্তু সেই অসুস্থতা ও দুর্বলতার অবস্থাতেও জামাতে নামায আদায়ের প্রতি তিনি অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন।"

(তাজকিরাতুল মাহদী, পৃ. ৬৯-৭০)

একবার তিনি বলেন: "আজও আমার মাথার অবস্থা ভালো নয়; মাথা ঘুরছে। কিন্তু যখন জামাতের সময় আসে, তখন মনে হয় যে এখন জামাত হবে আর আমি তাতে শরিক হতে পারব না-এতে আমার দুঃখ হয়। তাই হোঁচট খেতে খেতে সেখানেই চলে আসি।"

(মালফুযাত, খণ্ড ৭, পৃ. ২১২)

এটি খুব প্রাথমিক সময়ের একটি ঘটনা। হযরত মিস্ত্রি ফকীর মুহাম্মদ সাহেব (রহ.), তাঁর পিতা জীবা-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে একবার প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম) ছাদ থেকে পড়ে যান। আমরা তাঁকে দেখতে গেলে এবং তিনি জ্ঞান ফিরে পেলে, প্রথমেই যে প্রশ্নটি করেন তা ছিল-নামাযের সময় হয়েছে কি না।

(রেজিস্টার রিওয়ায়াত সাহাবা, খণ্ড ১, পৃ. ৫৮; আল-ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ২৮ জানুয়ারি ২০২০)

সফরে নামাযের প্রতি যত্ন

যেমন অসুস্থতা মানুষের জন্য পরীক্ষা, তেমনি সফরও কষ্টসাধ্য; বরং হাদীসে সফরকে 'শাস্তির একটি অংশ' বলা হয়েছে। তথাপি, দাবি-পূর্ব ও দাবি-পরবর্তী সময়ে প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম) নানাবিধ প্রয়োজনে বহু সফর করেছেন। কিন্তু এসব সফরের প্রতিটিতেই নামাযের প্রতি তাঁর অসাধারণ যত্ন সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

বরং তিনি সফর শুরুই করতেন নফল নামাযের মাধ্যমে। তাঁর খাদেম মির্জা দীন মুহাম্মদ সাহেব (রহ.), লঙ্গরওয়াল, বর্ণনা করেন: "তিনি রোযা ও নামাযে নিয়মিত এবং শরীয়তের প্রতি গভীর অনুরাগী ছিলেন। এই আগ্রহই আমাকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করে এবং আমি তাঁর খেদমতে থাকতে শুরু করি। যখন তিনি মোকদ্দমার অনুসরণে যেতেন, তখন আমাকে ঘোড়ায় নিজের পেছনে বসিয়ে নিতেন। যেদিন তাঁর বাটালায় যাওয়ার কথা থাকত, সেদিন যাত্রার পূর্বে তিনি দুই রাকাত নফল নামায আদায় করতেন।"

(তারিখ-এ-আহমদিয়্যাত, খণ্ড ১, পৃ. ৭৬)

মোকদ্দমার সময় নামাযের প্রতি যত্ন

মোকদ্দমার কারণে তাঁকে বহুবার সফর করতে হয়েছে। কিন্তু মামলাগুলো যতই জটিল বা গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, তিনি সর্বাবস্থায় নামায আদায়কেই অগ্রাধিকার দিতেন। মোকদ্দমা চলাকালীন সময়ে তিনি কখনও একটি নামাযও কাযা হতে দেননি। এমনকি আদালতে উপস্থিত থাকাকালীন নামাযের সময় হয়ে গেলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্?র হুকুম পালনে রত হয়ে যেতেন এবং এমন একাগ্রতার সঙ্গে নামায আদায় করতেন যেন তিনি কেবল

নামায পড়ার উদ্দেশ্যেই সেখানে এসেছেন–অন্য কোনো কাজ তাঁর সামনে নেই।

হযরত শাইখ ইয়াকূব আলী ইরফানী সাহেব (রহ.) বর্ণনা করেন: "হযরত মসীহ মওউদের খাদেম গফ্ফারের কাজ ছিল এই যে, যখনই হুযূর মোকদ্দমার জন্য সফর করতেন, সে তাঁর সঙ্গে থাকত এবং একটি লোটা ও জায়নামায বহন করত। সে সময় তাঁর নিয়ম ছিল–রাতে খুব অল্প ঘুমাতেন; রাতের অধিকাংশ সময় জেগে থাকতেন এবং সারা রাত অত্যন্ত করুণ ও হৃদয়স্পর্শী সুরে ধীরে ধীরে গুনগুন করতে থাকতেন।"

(শামায়েলে আহমদ, পৃ. ২৮)

তিনি আরও উল্লেখ করেন: "(সম্ভবত ১৯০৩ সালে) করম দীন মোকদ্দমার সময় একদিন যখন হুযূর আদালতকক্ষে উপস্থিত ছিলেন, তখন যোহরের নামাযের সময় অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং আসরের সময়ও সংকুচিত হয়ে আসে। তখন হুযূর আদালতের নিকট নামায পড়ার অনুমতি চান এবং বাইরে এসে বারান্দায় একাকী দুই নামায একত্রে আদায় করেন।"

(যিকরে হাবীব, পৃ. ১১০)

আরেকটি মোকদ্দমার প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন: "আমি একটি মামলার অনুসরণে বাটালায় গিয়েছিলাম। নামাযের সময় হলে আমি নামাযে দাঁড়াই। চপড়াসি ডাক দিল, কিন্তু আমি নামাযে মগ্ন ছিলাম। প্রতিপক্ষ উপস্থিত হয়ে একতরফা কার্যক্রমের সুযোগ নিতে চাইল এবং এ বিষয়ে জোর প্রচেষ্টা চালাল। কিন্তু আদালত আদেশ জারি করে তার বিরুদ্ধে রায় দেয় এবং আমার পক্ষে ডিক্রি ঘোষণা করে। আমি যখন নামায শেষ করে গেলাম, তখন আমার ধারণা ছিল যে বিচারক হয়তো আইনি দৃষ্টিতে আমার অনুপস্থিতি বিবেচনা করেছেন। কিন্তু আমি উপস্থিত হয়ে বললাম যে আমি নামায পড়ছিলাম, তখন তিনি বললেন, 'আমি তো ইতোমধ্যে আপনার পক্ষে ডিক্রি দিয়ে দিয়েছি।'

(হায়াতে আহমদ, পৃ. ৭৪)

আদালতে অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে রায় ঘোষিত হওয়া একটি মহান ঐশী নিদর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল।

একটি অন্য ঘটনার প্রসঙ্গে তিনি বলেন–

"মার্টিন ক্লার্কের মামলার প্রায় পঁচিশ বছর পূর্বে আমি একবার স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, আমি একটি আদালতে কোনো বিচারকের সামনে উপস্থিত আছি। নামাজের সময় হয়ে গেল। তখন আমি সেই বিচারকের নিকট নামাজ আদায়ের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তিনি প্রফুল্ল ও উন্মুক্ত মুখে আমাকে অনুমতি দিলেন। অতএব, সেই স্বপ্নের অনুরূপ এই মামলায়ও বিচারকার্য চলাকালীন আমি যখন ক্যাপ্টেন ডগলাসের নিকট নামাজের জন্য অনুমতি চাইলাম, তখন তিনিও অত্যন্ত সন্তোষের সঙ্গে আমাকে অনুমতি দিলেন।"

(নুযূলুল মসীহ, রূহানী খাযাইন, খণ্ড ১৮, পৃ. ৫৮৮)

দুনিয়াবি শাসকদের সঙ্গে সাক্ষাতে ইবাদতের গুরুত্ব

১৯০৮ সালে পাঞ্জাবের ফিনান্সিয়াল কমিশনার স্যার জেমস উইলসন এক দিনের সফরে কাদিয়ানে আগমন করেন। তাঁর সঙ্গে গুরদাসপুর জেলার ডেপুটি কমিশনারসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণও ছিলেন। জামা'আতের একটি প্রতিনিধি দল তাঁকে অভ্যর্থনা জানায়। আলোচনার এক পর্যায়ে ফিনান্সিয়াল কমিশনার হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অতঃপর বিকেল পাঁচটায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর কয়েকজন খাদেমসহ সেখানে উপস্থিত হন।

ফিনান্সিয়াল কমিশনার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অত্যন্ত আনন্দিত হন। পরে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে তিনি নিজেই বর্ণনা করেন: "আমরা ফিনান্সিয়াল কমিশনারের নিকট ইসলামের গুণাবলি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেছি এবং আমাদের পক্ষ থেকে প্রমাণ সম্পূর্ণরূপে পৌঁছে দিয়েছি। তিনি আরও আলোচনা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সেগুলো ছিল দুনিয়াবি বিষয়। আমি তাঁকে বললাম, 'আপনি দুনিয়াবি শাসক; আল্লাহ আমাদের দ্বীনের জন্য রূহানি শাসক বানিয়েছেন। যেমন আপনার দাপ্তরিক কাজের নির্ধারিত সময় আছে, তেমনি আমাদের কাজেরও নির্ধারিত সময় রয়েছে। এখন আমাদের নামাজের সময় হয়ে গেছে।' আমরা উঠে দাঁড়ালাম। ফিনান্সিয়াল কমিশনারও উঠে দাঁড়ালেন এবং প্রফুল্লচিত্তে আমাদের সঙ্গে তাঁবু পর্যন্ত বাইরে এলেন। তিনি টুপি খুলে সম্ভাষণ জানালেন, বিদায় গ্রহণ করলেন এবং চলে গেলেন।"

(সীরত আহমদ, হযরত মাওলভী কুদরতুল্লাহ সানূরী সাহেব, পৃ. ৫৭)

মর্যাদা ও প্রশান্তি

নামাজ প্রশান্তি ও স্থিরতার সঙ্গে আদায় করা আধ্যাত্মিক রুচি ও প্রেমের একটি লক্ষণ। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর নামাজের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল শান্তভাব, স্থিরতা ও মর্যাদাপূর্ণ ভঙ্গি। তাঁর কিয়াম, রুকূ, সেজদা ও কা'দাহ–প্রত্যেক রুকনে সংযম, বিনয় ও গাম্ভীর্য প্রকাশ পেত।

হযরত কাজী মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব (রা.) বলেন: "আমি বহুবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–কে ফরজ নামাজ ও তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতে দেখেছি। তিনি অত্যন্ত প্রশান্তির সঙ্গে নামাজ আদায় করতেন।"

(সীরতুল মাহদী, খণ্ড ৩, পৃ. ৪৮)

হযরত মাওলভী মুহাম্মদ ইব্রাহিম সাহেব বাকা পুরী (রা.) বর্ণনা করেন: "মসীহ মওউদ (আ.)–এর রুকূ, কিয়াম, কওমাহ এবং জালসা ছিল মধ্যম মানের। প্রত্যেক রুকনে পরিপূর্ণ স্থিরতা ও তৃপ্তি প্রকাশ পেত।"

(রেজিস্টার রিওয়ায়াত, খণ্ড ৮, পৃ. ৬৭; আল–ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২১ জানুয়ারি ২০২০)

তাহাজ্জুদ ও নফল নামাজ

তাহাজ্জুদ নামাজ সর্বদা নেককার ব্যক্তিদের একটি বিশেষ পরিচয়চিহ্ন হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কারণ এটি সেই সময়, যখন পৃথিবী ঘুমের ঘোরে নিমগ্ন থাকে, আর আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ নিজেদের আরাম ত্যাগ করে তাঁর স্মরণে নিমগ্ন হন।

হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদিক সাহেব (রা.) বলেন: "তিনি তাহাজ্জুদ নামাজের জন্য অত্যন্ত নিয়মিতভাবে জাগ্রত হতেন।"

(আল–ফযল, ৩ জানুয়ারি ১৯৩১) হযরত মির্জা দীন মুহাম্মদ সাহেব (রা.), লঙ্গরওয়াল, বর্ণনা করেন–

"আমি শৈশবকাল থেকেই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–কে দেখে আসছি। আমি তাঁকে প্রথম দেখেছিলাম মির্জা গুলাম মুর্তজা সাহেবের জীবদ্দশায়, যখন আমি সম্পূর্ণ ছোট শিশু ছিলাম। তাঁর অভ্যাস ছিল, তিনি রাতে এশার নামাজের পর দ্রুত শুয়ে পড়তেন। তারপর প্রায় রাত একটার সময় তাহাজ্জুদের জন্য জেগে উঠতেন। তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতে থাকতেন। ভোরে ফজরের আজান হলে তিনি প্রথমে বাড়িতে সুন্নত নামাজ আদায় করতেন, তারপর মসজিদে গিয়ে জামাতে নামাজ পড়তেন।"

(সীরতুল মাহদী, খণ্ড ৩, পৃ. ২০)

হযরত মুহাম্মদ জমীল সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন–

"যখন প্লেগ রোগ ছড়িয়ে পড়ে এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বাগানে অবস্থান করছিলেন, তখন আমরা রাতের বেলা পাহারা দিতাম। রাতের যে অংশেই আমরা তাঁর শিবিরের পাশ দিয়ে যেতাম, তাঁকে সর্বদা নামাজে মশগুল দেখতে পেতাম। আল্লাহই জানেন, তিনি কখন ঘুমাতেন। একবার তিনি লাহোরে গমন করলে আমাদের হেডমাস্টার হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদিক সাহেব আমাদের শ্রেণিকেও সঙ্গে নিয়ে যান। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয় তাঁর কক্ষের পাশেই। তিনি রাত ১১টা পর্যন্ত অতিথিদের সঙ্গে ব্যস্ত থাকতেন, তারপর সারারাত তাহাজ্জুদে অতিবাহিত করতেন। আমরা যখনই জেগে উঠতাম, তাঁকে নামাজে রত অবস্থায় দেখতাম।"

(রেজিস্টার রিওয়ায়াত, খণ্ড ৬, পৃ. ২১–২২; আল–ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০)

হযরত মাস্টার নজীর হুসাইন সাহেব (রা.) বলেন–

"একবার ঝেলম যাওয়ার পথে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমার দাদা হযরত মিয়াঁ চিরাগউদ্দীন সাহেবের বাড়ি, লাহোরের মুবারক মঞ্জিলে অবস্থান করেন। আমি তাঁর কক্ষের বাইরে দালানে দরজার পাশে ঘুমিয়ে ছিলাম। রাত ৩টার সময় ঘুম ভেঙে দেখি, তিনি নামাজ পড়ছেন। আমি অজু করে কিছু দূরে দাঁড়িয়ে নামাজ শুরু করি। আমি অত্যন্ত চেষ্টা করেছি যেন তাঁর কিয়াম, রুকূ বা সিজদার সময়কাল অনুসরণ করতে পারি, কিন্তু পারিনি। মাত্র দুই রাকাতেই আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ি, অথচ তিনি তখনও সেই একই রাকাতে ছিলেন, যেটিতে আমি শরিক হয়েছিলাম।"

(রেজিস্টার রিওয়ায়াত, খণ্ড ৭, পৃ. ৬৮–৬৯; আল–ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০)

একবার তীব্র অসুস্থতার সময় তিনি তাহাজ্জুদের জন্য উঠেছিলেন, কিন্তু অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। তখন তাঁর প্রতি ওহি নাজিল হয় যে, এ ধরনের অবস্থায় দাঁড়িয়ে তাহাজ্জুদ আদায়ের পরিবর্তে শুয়ে থেকেই একটি নির্দিষ্ট দোয়া পাঠ করতে হবে।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

(যিকর–ই–ইলাহী, হযরত মুসলে মওউদ, পৃ. ১১৩)

তাহাজ্জুদে ক্রন্দন ও আর্তি

হযরত হাফিজ হামিদ আলী সাহেব (রা.), যিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর একজন খাদেম ছিলেন, বর্ণনা করেন–

"তাহাজ্জুদের সময় হুজুর এত ধীর ও নীরবে উঠতেন যে আমি টেরই পেতাম না। তবে কখনো কখনো খুশূ' ও খুযূ'র প্রভাবে তাঁর কণ্ঠস্বর অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছুটা উঁচু হয়ে গেলে আমি জানতে পারতাম এবং লজ্জিত হয়ে উঠে পড়তাম। তিনি সিজদা অত্যন্ত দীর্ঘ করতেন। মনে হতো যেন সেই ক্রন্দন ও আর্তনাদে তিনি গলে গিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাবেন। তাহাজ্জুদের জন্য তিনি নিয়মিতভাবে উঠতেন।"

(আসহাবে আহমদ, খণ্ড ১৮, পৃ. ৭৪)

সিয়ালকোটে চাকরির সময় তাঁর প্রায়শই এই রীতি ছিল যে তিনি বাড়ি থেকে বের হতেন শরীরে চাদর জড়িয়ে, কেবল মুখের এতটুকু অংশ খোলা রাখতেন যাতে পথ দেখা যায়। কচেহরি থেকে কাজ শেষ করে বাসস্থানে ফিরে দরজা বন্ধ করে দিতেন এবং পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত ও যিকরে ইলাহীতে মগ্ন হয়ে যেতেন।

এই মুবারক পদ্ধতি দেখে কিছু কৌতূহলী স্বভাবের লোকের মনে সন্দেহ জন্মাল–তিনি দরজা বন্ধ করে কী করেন তা অনুসন্ধান করা উচিত। একদিন এই "তদন্তকারী" দল তাঁর তথাকথিত "গোপন ষড়যন্ত্র"উদ্ঘাটন করল। অর্থাৎ তারা স্বচক্ষে দেখল–তিনি জায়নামাজে উপবিষ্ট, হাতে পবিত্র কুরআন, আর চরম বিনয়, কোমলতা,

আকুলতা, আর্তি ও ব্যাকুল প্রার্থনায় দোয়া করছেন:

"হে আল্লাহ! এটি তোমার কালাম। তুমি নিজে শিক্ষা না দিলে আমি তা বুঝতে পারব না।"

(তারীখে আহমদিয়্যত, খণ্ড ১, পৃ. ৮৫)

মাই হায়াত বিবি সাহেবা, ফজল দীন সাহেবের কন্যা, বর্ণনা করেন–

"মির্জা সাহেব ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করতেন এবং আঙিনায় বসে কুরআন পড়তে থাকতেন। আমার পিতা বলতেন, মির্জা সাহেব কখনো কখনো কুরআন পড়তে পড়তে সিজদায় লুটিয়ে পড়তেন এবং দীর্ঘ সিজদা করতেন। তিনি এত কাঁদতেন যে মাটি ভিজে যেত।"

(সীরতুল মাহদী, খণ্ড ৩, পৃ. ৯৩)

পুঞ্চ জেলার পঠানা গ্রামের হযরত মিয়াঁ সানওয়ালা বর্ণনা করেন–তিনি এক থেকে দুই ঘণ্টা নামাজে দাঁড়িয়ে থাকতেন। সিজদায় গেলে দুই দুই ঘণ্টা সিজদায় পড়ে থাকতেন। সিজদার সময় তাঁর কাছ থেকে এমন শব্দ বের হতো যেন ফুটন্ত হাঁড়ি থেকে আওয়াজ বের হচ্ছে। ক্রন্দনের কারণে সিজদার স্থান ভিজে যেত।

(তারীখে আহমদিয়্যত কাশ্মীর, পৃ. ৬৭)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজে ও তাঁর জামা'আতের পরিচয়চিহ্ন হিসেবে নামাজকেই নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি বলেন, তোমরা পাঞ্জেগানা নামাজ এবং নৈতিক অবস্থার দ্বারা পরিচিত হবে।

(মজমুআ ইশতিহারাত, খণ্ড ৩, পৃ. ৪৮)

হযরত ডা. মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, ইসলামের আরকানের মধ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন নামাজের ওপর এবং বলতেন: "নামাজ সুন্দরভাবে ও সঠিকভাবে আদায় করো।"

(সীরতুল মাহদী, খণ্ড ৩, পৃ. ১২৬)

নির্জনে ইবাদত

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নির্জনতা পছন্দ করতেন। যদি আল্লাহ তাআলা তাঁকে অজ্ঞাত অবস্থান থেকে বের করে মানবজাতির হিদায়েতের দায়িত্ব না দিতেন, তবে তিনি সারা জীবন নির্জনে ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। তাঁর নির্জন ইবাদত তাঁর অসাধারণ ইবাদত–রুচি ও আল্লাহর সঙ্গে গভীর সম্পর্কের উজ্জ্বল প্রমাণ।

হযরত মুফতি মুহাম্মদ সাদিক সাহেব (রা.) বলেন–

"রাতের তাহাজ্জুদের নির্জনতার পাশাপাশি দিনের বেলায়ও তিনি সাধারণত একটি নির্দিষ্ট সময় সম্পূর্ণ একাকী ইবাদতে অতিবাহিত করতেন। তাঁর বাসকক্ষের সঙ্গে একটি ছোট কক্ষ ছিল, যাকে 'বাইতুদ্–দু'আ' (দোয়ার ঘর) বলা হতো। তিনি ভেতর থেকে তা বন্ধ করে প্রায় দুই ঘণ্টা সম্পূর্ণ একাকী ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। সফরের সময়ও তাঁর জন্য একটি ছোট কক্ষ নির্জনের জন্য আলাদা রাখা হতো। করম দীন মামলার সময়, যখন তিনি কয়েক মাস গুরদাসপুরে অবস্থান করেছিলেন, ভাড়া নেওয়া বাড়ির প্রধান দরজা দিয়ে ঢুকতেই বাম পাশে একটি ছোট কক্ষ এই উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ছিল। সেখানে প্রতিদিন সকাল প্রায় ১০টা থেকে ১২টা পর্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ নির্জনে ইবাদত ও দোয়ায় মশগুল থাকতেন। প্রারম্ভিক যুগে, যখন তাঁর তেমন পরিচিতি ছিল না এবং লোকজনের আসা–যাওয়া কম ছিল, তখন তিনি প্রায়ই নির্জনতার সন্ধানে বাইরে জঙ্গলে চলে যেতেন এবং আলাদা বসে আল্লাহর ইবাদত করতেন।"

(আল–ফযল, ৩ জানুয়ারি ১৯৩১)

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন–

"তিনি সফরে থাকুন বা নিজ গৃহে–দোয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করতেন, যা 'বাইতুদ্–দু'আ' নামে পরিচিত ছিল। আমি যত স্থানেই তাঁর সঙ্গে গিয়েছি, দেখেছি তিনি দোয়ার জন্য অবশ্যই একটি পৃথক জায়গা নির্দিষ্ট করতেন এবং তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচির মধ্যে সবসময় একটি নির্দিষ্ট সময় দোয়ার জন্য আলাদা রাখতেন। কাদিয়ানে প্রাথমিক যুগে তিনি তাঁর বাসের জন্য নির্ধারিত চৌবারাতেই দোয়ায় মশগুল থাকতেন। পরে এ উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্ধারিত হয়। যখন আল্লাহ তাআলার অনন্ত ফয়সালায় মসজিদ সাধারণ ইবাদতখানা হয়ে গেল এবং নির্জনতা আর সম্ভব রইল না, তখন তিনি বাড়িতে একটি বাইতুদ্–দু'আ তৈরি করেন। ভূমিকম্পের সময় যখন হুজুর কিছুদিনের জন্য বাগানে অবস্থান করেন, তখন সেখানেও এ উদ্দেশ্যে একটি চবুতরা নির্মাণ করান। গুরদাসপুরে মামলার সূত্রে কিছুদিন অবস্থান করতে হলে সেখানেও বাইতুদ্–দু'আর ব্যবস্থা ছিল। মোটকথা, তাঁর জীবনের একটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য ছিল–তিনি দোয়ার জন্য একটি আলাদা স্থান রাখতেন। বরং জীবনের শেষ ভাগে কখনো কখনো বলতেন, 'অনেক কিছু লেখা হয়েছে এবং সবরকমভাবে ইত্তেমামে হুজ্জত করা হয়েছে। এখন মন চায়, কেবল দোয়াই করি।' দোয়ার সঙ্গে তাঁর একটি বিশেষ সম্পর্ক ছিল–বরং দোয়াই ছিল তাঁর জীবন। চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে তাঁর রূহ দোয়ার দিকেই নিবদ্ধ থাকত। তিনি প্রত্যেক সমস্যার চাবিকাঠি হিসেবে দোয়াকেই মনে করতেন এবং জামা'আতের মধ্যে একই চেতনা ও অভ্যাস গড়ে তুলতে চাইতেন–যেন তারা দোয়ার অভ্যাস গ্রহণ করে।"

(সীরত হযরত মসীহ মওউদ, পৃ. ৫০৪–৫০৫)

রোযা পালনের প্রতি যত্ন

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর রোযার প্রতি ছিল অসাধারণ অনুরাগ ও বিশেষ আধ্যাত্মিক রুচি। তিনি রমযান মোবারকের ফরজ রোযাগুলো অত্যন্ত যত্নসহকারে পালন করতেন এবং নফল রোযাও অধিক পরিমাণে রাখতেন। তাঁর নিকট রোযা কেবল বাহ্যিক ক্ষুধা–পিপাসা সহ্য করার নাম ছিল না; বরং এটি ছিল নফসের প্রশিক্ষণ, রূহের বিকাশ এবং আল্লাহ তাআলার বিশেষ নৈকট্য লাভের এক মাধ্যম। তিনি বলতেন, রোযা মানুষের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি করে, আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং দোয়া কবুলের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়। অতএব অসুস্থতা ও দুর্বলতার দিনগুলোতেও যখন স্বাস্থ্য অনুমতি দিত, তিনি অধিক পরিমাণে রোযা রাখতেন।

ফরজ রোযার পাশাপাশি তিনি শাওয়ালের ছয়টি রোযা রাখার প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব দিতেন এবং তা সুন্নতে নববীর অনুসরণে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। তাঁর একটি বিশেষ অভ্যাস ছিল–যখনই কোনো বিশেষ মিশন, জটিল বিষয় বা বড় কোনো নিদর্শনের জন্য দোয়া করার প্রয়োজন হতো, তিনি সে উদ্দেশ্যে রোযা রাখতেন।

যৌবনকালে আল্লাহ তাআলার ইশারায় তিনি দীর্ঘ সময় একটানা রোযা রেখেছিলেন। সেই রোযাগুলোর একটি বিশেষ দিক ছিল–তিনি গোপনে নিজের খাবার কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে দিয়ে দিতেন এবং পরিবারকে বুঝতে দিতেন না যে তিনি রোযাদার। তিনি খাদ্য এত কমিয়ে দিয়েছিলেন যে নিজেই বলেন, তিন মাসের শিশুও তা সহ্য করতে পারত না। তিনি বলেন–

"আমার স্মরণ আছে, জীবনের প্রারম্ভিক কালে একবার ইলহামের মাধ্যমে আমি টানা আট–নয় মাস রোযা রেখেছিলাম। কিন্তু এই রোযাগুলো এমনভাবে গোপন রেখেছিলাম যে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানত না। অনেক সময় এমন হতো যে বাড়ি থেকে আমার জন্য যে খাবার আসত, তা আমি কোনো মিসকীনকে দিয়ে দিতাম এবং নিজে সন্ধ্যা পর্যন্ত কিছুই খেতাম না এই রিয়াজতের ফলে আমার ওপর মুকাশাফার দরজা খুলে যায় এবং আমি বহু অদ্ভুত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করি।"

(কিতাবুল বারিয়্যাহ, রূহানী খাযাইন, খণ্ড ১৩, পৃ. ১৮১–১৮২)

প্রাকৃতিক দৃশ্য ও যিকরে ইলাহী

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব ইরফানী (রা.) হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন–

"যখনই আমার ডালহৌসি যাওয়ার সুযোগ হতো, পাহাড়ের সবুজ প্রান্তর এবং প্রবাহমান ঝরনাধারা দেখে অন্তরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহ তাআলার হামদের জোয়ার সৃষ্টি হতো এবং ইবাদতে এক বিশেষ স্বাদ অনুভূত হতো। আমি দেখতাম, সেখানে নির্জনতার জন্য উত্তম সুযোগ রয়েছে।"

(হায়াতে আহমদ, খণ্ড ১, অংশ ১, পৃ. ৮৫)

শেষ কর্মও ছিল নামাজ ও যিকরে ইলাহী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর পবিত্র জীবন যেমন ইবাদতে পরিপূর্ণ ছিল, তেমনি তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তগুলিও অতিবাহিত হয়েছে ইবাদতেই। তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাঁর পবিত্র জিহ্বায় আল্লাহ তাআলার প্রেম ও স্মরণ জারি ছিল। এভাবে তাঁর জীবন যেমন ইবাদতের মূর্ত প্রতীক ছিল, তেমনি তাঁর ইন্তেকালও সংঘটিত হয় ইবাদতের অবস্থায়।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)–এর শেষ দিনের (২৬ মে ১৯০৮) বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন যে, ভোর হলে তাঁর খাটিয়াটি উঠান থেকে ঘরের ভেতরে আনা হয়। একটু আলো ফুটতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "নামাজের সময় হয়েছে কি?" উত্তরে বলা হলো, হয়েছে। তখন তিনি বিছানায় শায়িত অবস্থায়ই হাত বিছানায় মেরে তায়াম্মুম করলেন এবং শোয়া অবস্থাতেই নামাজ আরম্ভ করলেন। কিন্তু নামাজের মাঝেই তাঁর ওপর অচেতনতার ভাব নেমে এলো এবং তিনি নামাজ পূর্ণ করতে পারলেন না।

কিছুক্ষণ পর তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, ফজরের নামাজের সময় হয়েছে কি? জানানো হলে যে হয়েছে, তখন তিনি পুনরায় নিয়ত বেঁধে শোয়া অবস্থায় নামাজ আদায় করলেন। এরপর অর্ধ–সংজ্ঞাহীন অবস্থা বিরাজ করছিল; কিন্তু যখনই সামান্য জ্ঞান ফিরে আসত, তখনই তাঁর মুখে শোনা যেত–

মহানবী (সা.)-এর বাণী

যখন তোমাদের কাছে কোনও ধর্মপরায়ণ ও নীতিবান ব্যক্তি বিবাহ প্রস্তাব পাঠায়, তখন সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে নিও; অন্যথায় পৃথিবীতে অশান্তি ও অরাজকতা তৈরী হবে। (তিরমিযি, কিতাবুন নিকাহ)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Abdur Rasheed, Basantapur, 24 PGS (s)

যুগ খলীফার বাণী

"জাতি সত্তা অর্জনের জন্য ঐক্য ও আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী।" (খুতবা জুমআ, প্রদত্ত- ৫ ডিসেম্বর, ২০১৪)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, Bankura (W.B)

"আল্লাহ, আমার প্রিয় আল্লাহ।" এদিকে তাঁর শারীরিক দুর্বলতা মুহূর্তে মুহূর্তে বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

(সিলসিলা আহমদিয়া, পৃ. ১৮৩)

হযরত মুসলেহ মওউদ(রা.) বলেন:

"এই দুনিয়ায় তাঁর শেষ কাজও ছিল ইবাদতে ইলাহী। তাঁর ইন্তেকালের সময় আমি তাঁর পদপ্রান্তে উপস্থিত ছিলাম। যতক্ষণ তিনি কথা বলতে সক্ষম ছিলেন, তাঁর মুখে এই শব্দ ছাড়া আর কিছু ছিল না– 'হে আমার প্রিয় আল্লাহ! হে আমার প্রিয় আল্লাহ!' রাতের শেষ অংশ এভাবেই কেটেছে, এমনকি গলা শুকিয়ে যাওয়ার কারণে কথা বলা কঠিন হয়ে পড়ে। যখন ঘরে ফজরের কিছু আলো প্রবেশ করতে দেখলেন, তখন বললেন, 'নামাজ!' তখন এই অধম তাঁর পা টিপে দিচ্ছিলাম, আর হযরত সাহেবজাদা মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.), যিনি শিয়রের কাছে বসেছিলেন, মনে করলেন তাঁকেই নামাজ পড়তে বলা হচ্ছে এবং আরজ করলেন যে তিনি নামাজ পড়ে ফেলেছেন। তিনি আবার বললেন, 'নামাজ!' এবং বুকে হাত বেঁধে নামাজ শুরু করলেন। এরপর আর কোনো শব্দ উচ্চারণ করেননি, অবশেষে প্রায় আটটার দিকে তিনি তাঁর প্রকৃত প্রভু ও প্রিয়তমের সান্নিধ্যে গমন করেন।

অতএব, এই পৃথিবীতে তাঁর শেষ কর্মও ছিল ইবাদত। নির্জনতায় তিনি ইবাদতে মশগুল থাকতেন, আর জনসমাগমেও আল্লাহর স্মরণেই রত থাকতেন। তাঁর জীবন ছিল ইবাদতে, আর তাঁর মৃত্যুও ঘটেছে ইবাদতের মধ্যেই।"

(আল-ফযল, ৩ জানুয়ারি ১৯৩১)

উপসংহার

সারকথা, প্রতিশ্রুত মসীহ (আ.)-এর পবিত্র জীবনের অধ্যয়ন সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে ইবাদত তাঁর জীবনের কোনো একাংশ ছিল না– বরং সেটিই ছিল তাঁর জীবনের প্রাণ। নামাজ, দোয়া, রোজা, যিকর এবং নিভৃত ও প্রকাশ্য- সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলার সঙ্গে গভীর, জীবন্ত ও প্রেমময় সম্পর্ক স্থাপনই ছিল তাঁর সীরতের বৈশিষ্ট্য।

তিনি নিজের বাস্তব জীবনের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন যে প্রকৃত সাফল্য, হৃদয়ের শান্তি এবং আত্মিক উন্নতির একমাত্র পথ হলো আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও পরিপূর্ণ দাসত্ব। তাঁর আদর্শ প্রত্যেক সেই ব্যক্তির জন্য দিশারী, যিনি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন করতে চান। অতএব, আমাদের উচিত তাঁর এই ইবাদতের স্পৃহা নিজেদের জীবনে ধারণ করার চেষ্টা করা, যেন আমরাও আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভে ধন্য হতে পারি।

(কিতাবুল বারিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৩, পৃ: ১৯৫-১৯৬)

যেমনটি আমি বিগত খুতবায় উল্লেখ করেছিলাম, তিনি (আ.) বহু স্থানে এটিও ব্যক্ত করেছেন যে, আমি এই সবকিছু এ কারণেই লাভ করেছি যে, আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় নবী (সা.)-এর পূর্ণ অনুসারী এবং তাঁর একনিষ্ঠ প্রেমিক। আর এর ফলে আমার প্রতি আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসার দ্বারসমূহও উন্মুক্ত হতে থাকে এবং আমার মাঝে এর উপলব্ধি সৃষ্টি হয়। অতঃপর মহান আল্লাহ্র অনুগ্রহের বারিধারা আমার ওপর বর্ষিত হতে থাকে। তাঁর জীবনচরিত বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর হৃদয়ের এই অবস্থার কথা তুলে ধরে হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) এক স্থানে লেখেন: হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন,

"মসজিদ হলো আমার আবাসস্থল, পুণ্যবানরা আমার ভাই, আল্লাহ্র যিকর আমার সম্পদ এবং তাঁর সৃষ্টি হলো আমার পরিবার।"

(হযরত শেখ ইয়াকুব আলি ইরফানি (রা.) রচিত হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবন চরিত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪০২)

অর্থাৎ, তিনি যা বর্ণনা করেছেন তার সবকিছুই মহান আল্লাহ্কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন:

"আমরা প্রতিটি বস্তু কে কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্যই ভালোবেসে থাকি। স্ত্রী হোক, সন্তান হোক কিংবা বন্ধুবান্ধব হোক– সবার সাথেই আমাদের সম্পর্ক কেবল আল্লাহ্র খাতিরে।"(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪২৩)

এটিই সেই শিক্ষা যা মহান আল্লাহ্ দান করেছেন এবং মহানবী (সা.) এই শিক্ষাই প্রচার করতে বলেছেন। আর এই যুগে মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কর্মের মাধ্যমেই এর সর্বোত্তম বহিঃপ্রকাশ ঘটে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক স্থানে বলেন:

"সত্যবাদীরা পরীক্ষার সময়েও অটল থাকেন এবং তারা জানেন, পরিশেষে আল্লাহ্ আমাদেরই সহায় হবেন। এই অধম যদিও এমন একনিষ্ঠ বন্ধু দের পেয়ে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞ, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ঈমান রাখে যে, যদি একজন ব্যক্তিও সাথে না থাকে এবং সবাই আমাকে ফেলে রেখে যে যার মতো নিজের নিজের পথ ধরে, তবুও আমার কোনো ভয় নেই। আমি জানি, মহান আল্লাহ্ আমার সাথে আছেন। যদি আমাকে পিষে ফেলা হয়, পদপিষ্ট করা হয় এবং আমি একটি ধূলিকণার চেয়েও তুচ্ছ হয়ে যাই আর চতুর্দিক থেকে কষ্ট, গালি ও অভিসম্পাতের সম্মুখীন হই, তবুও পরিশেষে আমিই বিজয়ী হবো। আমাকে তিনি ছাড়া আর কেউ চেনে না যিনি আমার সাথে আছেন। আমি কখনোই ধ্বংস হতে পারি না। শত্রুদের চেষ্টা বৃথা এবং হিংসুকদের পরিকল্পনা নিষ্ফল।

হে নির্বোধ ও অন্ধরা! আমার পূর্বে কোন সত্যবাদী ধ্বংস হয়েছে যে, আমি ধ্বংস হয়ে যাব? কোন প্রকৃত বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ্ অপমানের সাথে ধ্বংস করেছেন যে, আমাকে ধ্বংস করবেন? নিশ্চিতভাবে মনে রেখো এবং কান খুলে শুনে নাও– আমার আত্মা ধ্বংস হওয়ার আত্মা নয় এবং আমার প্রকৃতিতে ব্যর্থতার কোনো উপকরণ নেই। আমাকে সেই সাহস ও নিষ্ঠা দান করা হয়েছে যার সামনে পাহাড়ও তুচ্ছ। আমি কারো পরোয়া করি না। আমি নিঃসঙ্গ ছিলাম এবং একাকী আমি দেখেছিলাম। তবে আরেকটি ঘটনাও উল্লেখ করছি। তিনি (আ.) নিজের কক্ষে ছিলেন এবং বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, কোথাও যাচ্ছিলেন। আমি তাঁর কাছেই ছিলাম। (এমন সময়) আমাদের জে ঠি সাহেবার ব্যক্তিগত সেবিকা, যিনি জেঠি সাহেবার প্রায় কাছাকাছি সময়েই বয়আত করেছিলেন এবং বেহেশতী মাকবেরায় সমাহিত আছেন, (তিনি) হযরত আম্মাজানের কাছে আসেন। আত্মীয়তার খাতিরে তিনি তার কাছে আমাদের চাচা মির্যা ইমাম উদ্দীনের মৃত্যুতে সমবেদনা প্রকাশ করেন। সে যখন পাঞ্জাবীতে এই কথাটি বলছিল যে, 'সে কত ভালো মানুষ ছিল!' হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বাইরে বের হন। তাঁর পবিত্র চেহারা রক্তিম হয়ে উঠে। তিনি তাঁর লাঠি মাটিতে আঘাত করে বলেন, "হতভাগী! তুই আমার ঘরে বসে আমার খোদার শত্রুর প্র শংসা করছিস? মির্যা ইমাম উদ্দীন সাহেব ইসলামবিমুখ ছিল এবং আল্লাহ্ তা'লাকে নিয়ে উপহাস করত।" তাঁর (আ.) আত্মাভিমান এটা সহ্য করতে পারে নি যে, তাঁর ঘরে বসে এমন একজনের আলোচনা করা হবে। নওয়াব মুবারকা বেগম সাহেবা (রা.) লেখেন, তাঁর কণ্ঠে এমন প্রতাপ ছিল যে, সেই মহিলা সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যায়।

মির্যা ইমাম উদ্দীন সাহেব ছিল নাস্তিক, আর তাঁর (আ.) ঘরে এমন একজন নাস্তিকের এত প্রশংসা করা তার জন্য সহ্য করা ছিল অসম্ভব।

(তাহরীরাত মুবারিকা, পৃ: ২২৩-২২৪)

তিনি (রা.) শৈশব ও যৌবনকাল থেকেই তাঁর মনিব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসরণে আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসায় সময় অতিবাহিত করেছেন।

একটি রেওয়ায়েতে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লেখেন,

" একজন শিখ জমিদারের বিবৃতি, যিনি আমাদের দাদার পক্ষ থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য চাকরির প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন। একবার একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা প্রভাবশালী ব্যক্তি আমাদের দাদাকে জিজ্ঞেস করেন, "শুনেছি আপনার একটি ছোটো ছেলেও আছে, কিন্তু তাকে আমরা কখনো দেখি নি।" দাদাজান [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পিতা] মুচকি হেসে বলেন, "হ্যাঁ, আমার একটি ছোটো ছেলে আছে বটে, কিন্তু নববধূর মতো তাকে খুব কমই দেখা যায়। যদি তাকে দেখতে চাও, তবে মসজিদের কোনো কোণে গিয়ে দেখো। সে তো মুসীতাড় (অর্থাৎ মসজিদেই পড়ে থাকে)।"

(সীরাতে তৈয়্যবা, প্রণেতা-হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ, পৃ: ৯-১০)

এই রেওয়ায়েতটি মিরাজ দ্বীন উমর সাহেব আরো বিশদভাবে লিখেছেন। তিনি (হুযূরের পিতা) বলেন, মসজিদের অযুখানার কলের কাছে গিয়ে খোঁজো। সেখানে না পেলে হতাশ হয়ে ফিরে এসো না। মসজিদের ভেতরে চলে যেও এবং সেখানে কোনো এক কোণে খুঁজে দেখো। সেখানেও না পেলে নিরাশ হয়ে ফিরে যেও না। কোনো নামাযের চাটাইয়ে দেখো, হয়ত কেউ তাকে চাটাই দিয়ে পেঁচিয়ে একপাশে দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে। কারণ সে তো জীবিত থেকেও মৃত। তাঁর ফানাফিল্লাহ্ (আল্লাহ্তে বিলীন) অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, কেউ যদি তাঁকে চাটাই দিয়ে পেঁচিয়েও ফেলে, তবুও সে প্রতিবাদ করবে না,"

(হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনি, প্রণেতা- মেরাজুদ্দীন উমর, পৃ: ৬৭)

একইভাবে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) আরো একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। তিনি লেখেন, আমার কাছে হাজী আব্দুল মজীদ সাহেব লুধিয়ানভী বর্ণনা করেছেন, একবার হুযূর (আ.) লুধিয়ানায় অবস্থান করছিলেন। আমার বাড়িতে একটি

মহান আল্লাহ্র বাণী

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হইয়াছে। তোমরা ন্যায় সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবংঅসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করিয়া থাক এবং আল্লাহতে ঈমান রাখ। (আলে ইমরান:১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Ahmad Molla & Jahanara Bibi
From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (S)

যুগ ইমামের বাণী

কেবল মৌখিক বয়াতের অঙ্গীকারের কোনই মূল্য নাই, যে পর্যন্ত দৃঢ়-চিত্ততার সহিত উহার উপর আমল করা না হয়।

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late Hasan Laskar
From-Kutubuddin Laskar Sb. Banshra, 24 PGS (S)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028 Vol-11 Thursday, 5-12-Mar, 2026 Issue No.10-11

Act.
MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mob: +91 9815639670
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

সীরাতুল মাহদী

{১৫} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। এই নগণ্য ব্যক্তি নিবেদন করছে যে, যখন লাহোরে প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম) ইন্তেকাল করেন, তখন হযরত মাওলভী নূরুদ্দীন সাহেব সেই কক্ষে উপস্থিত ছিলেন না যেখানে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যখন হযরত মাওলভী সাহেব সংবাদ পেলেন, তখন তিনি এসে হযরত সাহেবের কপালে চুম্বন করলেন এবং অল্পক্ষণ পরই কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন। দরজার বাইরে পা রাখামাত্র মাওলভী সৈয়দ মুহাম্মদ আহসান সাহেব আবেগভরা কণ্ঠে তাঁকে বললেন, "আপনি আমার সিদ্দীক।" হযরত মাওলভী সাহেব বললেন, "মাওলভী সাহেব, এ বিষয়টি এখানেই থাক; কাদিয়ানে গিয়ে এর ফয়সালা হবে।" এই নগণ্য ব্যক্তির ধারণা, আমার ছাড়া আর কেউ এই সংলাপটি শোনেনি।

{১৬} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। এই নগণ্য ব্যক্তি নিবেদন করছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)-এর তিনটি আংটি ছিল। একটি আংটিতে খোদাই ছিল আলাইসাল্লাহু বিকাফিন 'আব্দাহু ("আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?চ), যার উল্লেখ তিনি তাঁর বিভিন্ন লেখায় করেছেন। এটি ছিল প্রথম আংটি এবং দাবি করার বহু আগেই এটি প্রস্তুত করা হয়েছিল। দ্বিতীয় আংটিতে তাঁর প্রাপ্ত ইলহাম গারাস্তু লাকা বিয়াদী রহমতী ওয়া কুদরাতী ইত্যাদি ("আমি তোমার জন্য আমার নিজ হাত দ্বারা-আমার রহমত ও ক্ষমতা দ্বারা-রোপণ করেছিচ) খোদাই ছিল। এটি দাবি করার পর প্রস্তুত করা হয় এবং দীর্ঘদিন তাঁর হাতে ছিল। ইলহামের বাক্যাংশ তুলনামূলক দীর্ঘ হওয়ায় এর পাথরটি ছিল সবচেয়ে বড়। তৃতীয় আংটি পরবর্তী বছরগুলোতে প্রস্তুত হয় এবং ইন্তেকালের সময় এটি তাঁর হাতেই ছিল। এই আংটি তিনি নিজে প্রস্তুত করাননি; বরং কেউ তাঁর কাছে আরজ করেছিল যে, হুজুরের জন্য একটি আংটি তৈরি করতে চায়-তাতে কী লেখা হবে? হুজুর উত্তরে বলেছিলেন, "মওলা বাস"("প্রভুই যথেষ্টচ)। অতএব সেই ব্যক্তি এই শব্দগুলো খোদাই করে আংটিটি তাঁকে পেশ করেন।

প্রতিশ্রুত মসীহের ইন্তেকালের সময় একজন ব্যক্তি তাঁর হাত থেকে এই আংটিটি খুলে নিয়েছিল, পরে তা সম্মানিতা মাতাসাহেবার নিকট থেকে পুনরুদ্ধার করা হয়। ইন্তেকালের কিছুদিন পর মাতাসাহেবা আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে এই তিনটি আংটি নিয়ে লটারি করেন। আলাইসাল্লাহু বিকাফিন 'আব্দাহু খোদাইকৃত আংটিটি বড় ভাই-অর্থাৎ হযরত খলিফাতুল মসীহ সানীর-নামে ওঠে। গারাস্তু লাকা বিয়াদী রহমতী ওয়া কুদরাতী (তাযকিরা, পৃ. ৪২৮, টীকা, প্রকাশিত ২০০৪) খোদাইকৃত আংটিটি এই নগণ্য ব্যক্তির নামে ওঠে এবং "মওলা বাস"খোদাইকৃত আংটিটি প্রিয় ভাই মিয়াঁ শরীফ আহমদ সাহেবের নামে ওঠে। অনুরূপ আরও দুটি তাবারুক বোনদের অংশে আসে।

{১৭} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। সম্মানিতা মাতাসাহেবা আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম) একবার উল্লেখ করেছিলেন-তিনি এক মামলার অনুসরণে আদালতে গিয়েছিলেন। অন্যান্য মামলার শুনানি চলতে থাকে এবং তিনি বাইরে একটি গাছের নিচে অপেক্ষা করছিলেন। নামাজের সময় হলে তিনি সেখানেই নামাজ শুরু করেন। নামাজ চলাকালীন আদালত থেকে তাঁকে বারবার ডাকা হচ্ছিল, কিন্তু তিনি নামাজ অব্যাহত রাখেন। নামাজ শেষ করলে তিনি দেখেন আদালতের এক কর্মচারী তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সালাম ফেরানো মাত্র সে বলল, "মির্জা সাহেব, মোবারকবাদ-আপনি মামলায় জয়ী হয়েছেন।"

{১৮} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। সম্মানিতা মাতাসাহেবা আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম) তাঁর যৌবনকাল সম্পর্কে বলতেন-সেই সময় তিনি ইঙ্গিত পান যে, এ পথে উন্নতির জন্য রোজা রাখা প্রয়োজন। তিনি বলতেন, এরপর তিনি টানা ছয় মাস রোজা রেখেছিলেন এবং ঘরে বা বাইরে কেউ জানত না যে তিনি রোজা রাখছেন। সকালে ঘর থেকে খাবার এলে তিনি তা কোনো অভাবগ্রস্তকে দিয়ে দিতেন এবং সন্ধ্যায় নিজে আহার করতেন। আমি মাতাসাহেবাকে জিজ্ঞেস করি-জীবনের শেষ ভাগেও কি তিনি নফল রোজা রাখতেন? মাতাসাহেবা বলেন, শেষ জীবনেও তিনি রোজা রাখতেন, বিশেষ করে শাওয়ালের ছয়টি রোজা নিয়মিতভাবে রাখতেন। যখনই কোনো বিশেষ বিষয়ে দোয়া করার প্রয়োজন হতো, তিনি রোজা রাখতেন। তবে শেষ দুই-তিন বছরে দুর্বলতা ও শারীরিক অবসাদের কারণে তিনি রমজানের রোজাও রাখতে সক্ষম ছিলেন না। (এই নগণ্য ব্যক্তি নিবেদন করছে যে, কিতাবুল বারিয়্যা-তে হযরত সাহেব রোজার সময়কাল আট-নয় মাস উল্লেখ করেছেন।)

{১৯} বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। সম্মানিতা মাতাসাহেবা আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম) প্রথমবার মাথা ঘোরা ও হিস্টেরিয়ার আক্রমণে আক্রান্ত হন বশীর আওয়াল (আমাদের এক বড় ভাই, যিনি ১৮৮৮ সালে ইন্তেকাল করেন)-এর মৃত্যুর কয়েক দিন পর। রাতে ঘুমের মধ্যে তিনি একধরনের ওঠার অনুভূতি পান, এরপর তাঁর অবস্থা খারাপ হয়ে যায়; তবে সে আক্রমণটি ছিল হালকা। কিছুদিন পর একদিন তিনি নামাজের জন্য বাইরে যান এবং যাওয়ার সময় বলেন যে, আজ তাঁর শরীর কিছুটা খারাপ। অল্পক্ষণ পর শেখ হামিদ আলী (প্রতিশ্রুত মসীহের এক পুরনো ও নিষ্ঠাবান খাদেম, বর্তমানে মৃত) দরজায় কড়া নেড়ে দ্রুত এক বড় পাত্র পানি গরম করতে বলেন। মাতাসাহেবা বুঝতে পারেন যে হযরত সাহেবের অবস্থা খারাপ হয়েছে। তিনি এক মহিলা কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করতে বলেন। শেখ হামিদ আলী বলেন, কিছুটা খারাপ হয়েছে। পর্দার ব্যবস্থা করে মাতাসাহেবা মসজিদে যান এবং দেখেন তিনি শুয়ে আছেন। কাছে গেলে তিনি বলেন, "আমার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তবে এখন কিছুটা আরাম আছে। আমি নামাজ পড়াচ্ছিলাম, তখন দেখলাম একটি কালো বস্তু আমার সামনে থেকে উঠে আকাশের দিকে চলে গেল; এরপর আমি চিৎকার করে মাটিতে পড়ে যাই এবং অজ্ঞানসদৃশ অবস্থায় চলে যাই।" মাতাসাহেবা বলেন, এরপর থেকে তাঁর নিয়মিত আক্রমণ শুরু হয়।

এই নগণ্য ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেন-আক্রমণের সময় কী হতো? মাতাসাহেবা বলেন, তাঁর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যেত, শরীরের পেশি শক্ত হয়ে যেত-বিশেষত ঘাড়ের পেশি-মাথা ঘুরত, এবং তখন তিনি নিজের শরীর সামলাতে পারতেন না। প্রথমদিকে আক্রমণগুলো খুব তীব্র ছিল; পরে হয় তীব্রতা কমে যায়, নয়তো শরীর কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আমি জিজ্ঞেস করি-এর আগে কি মাথার কোনো সমস্যা ছিল? মাতাসাহেবা বলেন, আগে সাধারণ মাথাব্যথা হতো। আমি জিজ্ঞেস করি-এর আগে কি হযরত সাহেব নিজেই নামাজ পড়াতেন? মাতাসাহেবা বলেন, হ্যাঁ; কিন্তু আক্রমণ শুরু হওয়ার পর তিনি তা ছেড়ে দেন। এই নগণ্য ব্যক্তি নিবেদন করছে যে, এটি মসীহ দাবির আগেকার ঘটনা।

(সীরাতুল মাহদী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩-১৫, প্রকাশিত কাদিয়ান) (চলবে)

****

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী (আ.) বলেন:

খোদা তা'লা আমাকে একাধারে সংবাদ দিয়েছেন, তিনি আমাকে মহাসম্মানে ভূষিত করবেন। তিনি মানুষের হৃদয়ে আমার ভালবাসা প্রোথিত করে দিবেন এবং আমার জামা'তকে সারা বিশ্বে বিস্তৃত করবেন। সকল সম্প্রদায়ের ওপর আমার জামা'তকে তিনি জয়যুক্ত করবেন। আর আমার জামা'তের সদস্যরা জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞানে এমন উৎকর্ষ লাভ করবে যার ফলে তারা নিজেদের সততার জ্যোতি এবং দলিল-প্রমাণ ও উজ্জ্বল নিদর্শনাবলীর আলোকে সবাইকে নির্বাক করে দিবে। সব জাতি এই ঝর্ণা থেকে পানি পান করবে। এ জামা'ত দ্রুত বৃদ্ধি পাবে আর বিস্তৃতি লাভ করতে করতে পুরো বিশ্বে ছেয়ে যাবে। অনেক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে, অনেক পরীক্ষাও দেখা দিবে কিন্তু আল্লাহ্ এসব প্রতিবন্ধকতাকে মাঝখান থেকে অপসারণ করে দিবেন এবং তিনি অঙ্গীকার পূর্ণ করবেন।অতএব হে তোমরা যারা শুনছ! এসব কথাকে ভালভাবে স্মরণ রেখ এবং এসব ভবিষ্যদ্বাণীকে নিজেদের সিন্দুকে সংরক্ষিত করে রেখ কেননা এটি খোদা তা'লার বাণী যা একদিন পূর্ণ হবে।"

(তাজাল্লিয়াতে ইলাহিয়্যা, রূহানী খাযায়েন, বিংশতম খণ্ড, পৃ. ৪০৯-৪১০)

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

এবং যখন ভাগ-বন্টনের সময় নিকটাত্মীয়, এতীম এবং মিসকীনগণ উপস্থিত হয়, তখন তাহাদিগকেও উহা হইতে দিও এবং তাহাদের সহিত ন্যায়-সঙ্গত কথা বলিও। (আন-নিসা: ৯)

দোয়াপ্রার্থী: Late-Azima Khatun,
From: Mirza Enayetulla Sb, Harhari, Murshidabad

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir